

প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস







পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে
অনুমোদিত।
[Vide T. B. No. VI/H/79/61 dated 5.12. 79]

প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস

(ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য)

অসিত কুমার সেন. এম. এ.
অধ্যাপক, স্কটিশ চার্চ কলেজ ও দেশবন্ধু কলেজ
এবং
People and Politics in early Mediaeval India,
International relations Since World war I,
আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস, ভারতবর্ষের ইতিহাস,
(নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য) ও বাংলার ইতিহাস
(ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য) ইত্যাদির প্রণেতা।
ও
শ্রীমতী ললিতা সেন. এম. এ.

মণ্ডল ব্রাদার্স
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১নং বিধান সরণী· কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
এম. মণ্ডল
১নং বিধান সরণী
কলিকাতা ৭০০০৭৩

মূল্য : ছয় টাকা

প্রথম প্রকাশ : জুন, ১৯৭৯
দ্বিতীয় প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৮০
তৃতীয় প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৮২

[ভারত সরকার প্রদত্ত স্বল্প মূল্য কাগজে এই পুস্তক আংশিক ছাপা হইয়াছে]

॥ মুদ্রাকর ॥
শ্রীগোবিন্দলাল চৌধুরী
ভগবতী প্রেস
১৪/১ ছিদাম মুদি লেন
কলিকাতা ৭০০০০৬

ভূমিকা

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পাঠক্রম অনুসারে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই বইটি লেখা হ'ল। এবারকার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পাঠক্রমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রাচীন সভ্যতার ইতিবৃত্ত ষষ্ঠশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সভ্যতার শুরু থেকে মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে এগিয়েছে। সভ্যতার প্রতি স্তরে মানুষ প্রকৃতির থেকে আদায় করেছে নব নব বিদ্যা, নব নব শক্তি। জ্ঞান, বিজ্ঞান, কলা ও কৃষ্টির অগ্রগতিতে মানুষের নবলব্ধ শক্তির প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন সভ্যতার অবদান মানুষকে যে প্রজ্ঞা দিয়েছে বর্তমানকালেও আমরা তার ফল উপভোগ করছি। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে; একশ্রেণীর মানুষ রাষ্ট্রে ও সমাজে একক প্রাধান্য বজায় রাখতে চেয়েছে। যারা সমাজ ও রাষ্ট্রের বোঝা বহন করে তাদের উপর ভর করে এই শাসকশ্রেণী নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রেখেছে। এই জন্য সমাজে ও রাষ্ট্রে বৈষম্য দেখা দিয়েছে। আবার এই বৈষম্য যে সংঘর্ষ ডেকে এনেছে তার মধ্যে নবজীবনের সূত্রপাত হয়েছে। এইভাবে চলমান ইতিহাস এগিয়ে চলেছে। প্রাচীন ইতিহাসের পাতায় পাতায় মানুষের এইসব সংগ্রামের ও অগ্রগতির কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

বিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের প্রতি নিবেদন, যাদের প্রয়োজনে এই বইটি লেখা হয়েছে তারা উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকতর উপযোগী করার উদ্দেশ্যে সহৃদয় শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাবিদ্‌দের সমালোচনা ও নির্দেশনা সাদরে গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি রইল।

ইতি—

গ্রন্থকারদ্বয়

২১শে জুন, ১৯৭৯

স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলিকাতা

অসিত কুমার সেন

ও

শ্রীমতী ললিতা সেন

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. গোড়ার কথা	১-৩
[আমরা ইতিহাস পড়ি কেন ১, প্রাচীন কালের মানুষের কথা কিরূপে জানা যায় ১, অনুশীলনী ৩]	
২. আদিম মানুষ	৪-১০
[সূচনা ৪, আগুনের ব্যবহার ৪, পুরাতন পাথরের যুগ ৪, নতুন পাথরের যুগ ৫, নতুন পাথরের যুগে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ৬, অনুশীলনী ৯]	
৩. তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ	১১-১৪
[সূচনা ১১, উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন ১১, শিল্প ও কারিগরী দক্ষতা ১১, বাণিজ্য ও জিনিসপত্রের লেনদেন ১২, সামাজিক জীবনে পরিবর্তনের সূচনা ১২, গোষ্ঠী বিরোধ ও রাষ্ট্রের উদ্ভব ১২, নদী উপত্যকায় সভ্যতা গড়ে উঠার কারণ ১৩, অনুশীলনী ১৩]	
৪. পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতা	১৫-৩৮
[**মেসোপটেমিয়া**ঃ অবস্থান ও প্রাচীনত্ব ১৬, ভূমির উর্বরতা ও উৎপন্ন দ্রব্য ১৭, বন্যারোধ ১৭, উপজীবিকা ১৭, সুমেরীয়দের সাফল্য ১৮, যানবাহন ও ব্যবসাবাণিজ্য ১৮, লিপি, অনুশীলনী ১৯। ১৬-২০	
মিশরঃ অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি ২১, ফ্যারাও ২২, পুরোহিত ২২, লিপি ২২, কর আদায়কারী ২৩, সৈনিক ও শ্রমজীবী ২৩, ব্যবসা ২৪, পিরামিড ২৪, ধর্মবিশ্বাস ২৫, মমি, উপজীবিকা ২৫, অনুশীলনী ২৬। ২১-২৭	
সিন্ধুসভ্যতাঃ নগর পরিকল্পনা ২৮, খাদ্য ও নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র ২০, শিল্পকলা ৩১, ব্যবসাবাণিজ্য ৩১, ধর্মবিশ্বাস ৩২, সামাজিক শ্রেণীবিভাগ ৩২, অনুশীলনী ৩৩। ২৭-৩৪	

বিষয়	পৃষ্ঠা
চীন ঃ হোয়াংহো ও ইয়াং সিকিয়াং উপত্যকা—পৌরাণিক যুগে চীন, অনুশীলনী ৩৫। ৩৪-৩৬	
নদী মাতৃক সভ্যতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ অর্থনৈতিক অবস্থা ৩৮, অনুশীলনী ৩৮] ৩৬-৩৮	
৫. লৌহ যুগ	৩৯-৪০
[লৌহের আবিষ্কার ৩৯, সমাজ ৩৮, অর্থনীতি ৪০, রাজতন্ত্র ৪০, অনুশীলনী ৪০]	
৬. বাবিলন, মিশর, ইরাণ ও ইহুদীদের ইতিবৃত্ত	৪১-৫৪
[**বাবিলনের কথা ঃ** সূচনা-কৃষি-বাণিজ্য ৪১, মন্দির ও পুরোহিত ৪২, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ৪২, হামুরাবির বিধান ৪৩, অনুশীলনী ৪৪।	
সাম্রাজ্যবাদী মিশরের ইতিবৃত্ত ঃ সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ ৪৫, পুরোহিত শ্রেণী ৪৬, অনুশীলনী ৪৭।	
ইরাণ বা পারস্যের উত্থান ঃ পারসিক সাম্রাজ্য ৪৮, জোরস্তার ৪৯, অনুশীলনী ৫০।	
ইহুদীদের ইতিবৃত্ত ঃ হিব্রুদের আদিকাহিনী ৫১, মিশরে ইহুদীদের অনুপ্রবেশ ৫১, মোজেসের নেতৃত্বে ইহুদীদের মিশর ত্যাগ ৫২, দাসত্ব থেকে মুক্তি ৫২, অনুশীলনী ৫৩]	
৭. গ্রীসের ইতিহাস	৫৫-৬৮
[গ্রীসের উপর ক্রীট সভ্যতার প্রভাব ৫৫, হোমারের যুগ ৫৬, নগর রাষ্ট্র ৫৭, সংস্কৃতিক বিনিময় ৫৭, উপনিবেশ স্থাপন ৫৮, এথেন্স ও স্পার্টা ৫৮, স্পার্টার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন ৫৯, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে এথেন্সের অগ্রগতি ৬০, এথেনীয় শিল্পকলা ও স্থাপত্য ৬২, ধর্ম ৬৩; ম্যাসিডন ৬৩, আলেকজান্দারের দিগ্বিজয় ৬৪, আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণ ৬৪, রোম কর্তৃক গ্রীস জয় ৬৬, অনুশীলন ৬৭]	

বিষয় পৃষ্ঠা

৮. রোম ৬৯-৮১

[রোমের জন্মকাহিনী ৬৯, কার্থেজের সঙ্গে লড়াই ৭০, হ্যানিবলের ইতালী আক্রমণ ৭০, আদি রোমক সমাজ ৭১, প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান ৭১, ক্রীতদাস প্রথা ও ক্রীতদাস বিদ্রোহ ৭২, জুলিয়াস সিজার ও রোমান গণতন্ত্রের অবসান ৭৩, রোমান সাম্রাজ্য ৭৫, রোমান সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ ৭৬ রোমান সাম্রাজ্যের পতন ৭৮, খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুত্থান ৭৯, অনুশীলনী ৮০]

৯. চীন ৮২-৮৬

[মহৎ শাং ৮২, কনফুসিয়াসের শিক্ষা ৮৩, চীনের প্রাচীর ৮৩, চিন সাম্রাজ্য ৮৪, অনুশীলন ৮৫]

১০. ভারতবর্ষ ৮৭-১০৮

[**আর্যদের আগমন** ৮৭, প্রাচীন আর্যদের সমাজ, ধর্ম এবং রাষ্ট্র ৮৮, অনুশীলনী ৯০।

জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব ৯১, মহাবীর ৯১, গৌতম বুদ্ধ ৯২, অনুশীলনী ৯৩।

প্রাচীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার যুগঃ মৌর্য, কুষাণ ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ৯৪, অনুশীলনী ৯৮।

প্রাচীন বাংলার কথা—প্রাচীন বাংলাঃ গুপ্তযুগের পতন পর্যন্ত—৯৯।

বিদেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ১০১, সমাজে বৈদেশিক সংযোগের প্রভাব ১০২, অনুশীলনী ১০৩

বিদেশী পর্যটকদের দৃষ্টিতে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ১০৪

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ১০৫, স্থাপত্য ১০৫, ভাস্কর্য ১০৬, সাহিত্য ১০৬, শিক্ষা ১০৭, বিজ্ঞান ১০৭, অনুশীলনী ১০৮

—০—

১

গোড়ার কথা

[● আমরা ইতিহাস পড়ি কেন? ● প্রাচীন কালের মানুষের কথা কিরূপে জানা যায়?]

আমরা ইতিহাস পড়ি কেন?

ইতিহাস আমাদের অতীতকালের ঘটনা জানতে সাহায্য করে। মানুষ মানুষের কথা শুনতে ভালবাসে। আমাদের জন্মের অনেক অনেক বছর আগে আমাদের এই পৃথিবীতে কি কি ঘটেছে তা জানবার জন্য আমাদের সকলেরই ইচ্ছে হয়। ইতিহাস পড়লে আমাদের আগেকার মানুষেরা কি রকম ছিল, কি খেত, কি ভাবে বাস করত, তাদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক কি রকম ছিল সব জানতে পারি।

মানুষের কাহিনী নিয়েই ইতিহাস, অর্থাৎ প্রথমে তারা কি রকম ছিল এবং পরে ধীরে ধীরে তারা নতুন নতুন কত কি শিখে আরও ভালভাবে বাঁচতে শিখল ইতিহাস পড়েই আমরা সে সব জানতে পারি। প্রাচীনযুগের মানুষকে ভালভাবে জীবনধারণ করতে প্রথমেই জোগাড় করতে হ'ল তার আহার, সেই আহারের জন্য তাকে শিখতে হ'ল কৃষি, তারপর থাকার জন্য চাই ভূমি। সেই ভূমি জোগাড় করবার জন্য তাকে ছড়িয়ে পড়তে হ'ল ডাইনে বাঁয়ে এদিকে সেদিকে। এইভাবে আস্তে আস্তে গড়ে উঠল গ্রাম আর নগর। নগর থেকে এলো নাগরিক সভ্যতা। ক্রমে ক্রমে এর থেকেই জন্ম নিল বর্তমান সভ্যতা। এই মানব সভ্যতার উত্থান পতনই ইতিহাসের কাহিনী।

প্রাচীনকালের মানুষের কথা কিরূপে জানা যায়ঃ সুপ্রাচীন যুগের পৃথিবীর ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুব কম। এই পৃথিবীতে মানুষের আগমন থেকে মানব ইতিহাসের শুরু। কিন্তু লিখিত ভাবে নিজের কথা বলার ক্ষমতা তখন মানুষের ছিল না। সেই যুগে, যে যুগে মানুষের অক্ষর-জ্ঞান হয় নি তখনকার কাহিনী জানতে আমাদের পুরাতত্ত্বের উপর নির্ভর করতে হয়।

পাঁচ হাজার বছর অথবা তারও আগে মানুষ যখন লিখতে শেখেনি তখনকার কাহিনী মানুষের তৈরী অস্ত্রশস্ত্র, বাসনপত্র ও ব্যবহৃত জিনিস দেখলে কিছুটা বোঝা যায়। যেমন এক জায়গায় যদি মাটি খুঁড়ে সেই যুগের পাথরের তৈরী অনেক জিনিস বা মাটির তৈরী পাত্র পাওয়া যায় তাহলেই বুঝতে পারব সেই সময়ের মানুষ সভ্যতায় কতটা এগিয়ে ছিল। আবার ধরা যাক্ কোন জায়গায় যদি মাটি খুঁড়ে অনেকগুলি মানুষের কঙ্কাল পাওয়া যায় তাহ'লে বলতে হবে নিশ্চয়ই কোন একটা যুদ্ধবিগ্রহ বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে তারা মারা গিয়েছিল। অনেক সময় প্রাচীন মানুষ গুহাচিত্রে তাদের মনের কথা বলবার চেষ্টা করেছে। অতি প্রাচীনকালে যে সময়ের কোন লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় না সেই সময়কে প্রাগৈতিহাসিক (প্রাক্-ঐতিহাসিক) যুগ বলা হয়।

কিন্তু লিখিত ইতিহাসের অভাব থাকা সত্ত্বেও মানুষ বুদ্ধিবলে প্রাচীন যুগের মানুষের অনেক কথা জানতে পেরেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন সভ্যতার যে সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে আমরা ঐ সময়ের মানুষের জীবনকথা জানতে পারি।

এইগুলির মধ্যে শিলালিপি স্তম্ভলিপি, তাম্রলিপি, প্রাচীনমুদ্রা, পোড়ামাটির ফলক ও খননকার্যের ফলে পাওয়া জিনিসপত্রই প্রধান। এসবই হচ্ছে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান, এখানকার মানুষ নানাভাবে মাটি খুঁড়ে প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছেন। সেই সঙ্গে পাওয়া গেছে সভ্যতার অনেক নিদর্শন।

প্রাচীন মুদ্রা থেকে জানা যায় রাজার পরিচয় ও সন তারিখ ইত্যাদি। শিলালিপি, স্তম্ভলিপি ইত্যাদি থেকে আবার নানাধরণের খবর পাওয়া যায়। এক একটি লিপি তৈরী হয়েছে এক একটি উদ্দেশ্যে। এদের কোনটিতে আছে রাজ্যজয়ের কাহিনী, কোথাও আছে রাজার আদেশ, উপদেশ, ধর্মকথা বা দানের কথা।

পুরাকালের মানুষের ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদ, জিনিসপত্র, আসবাবপত্র ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট প্রভৃতি থেকে আমরা এই সময়ের মানবসভ্যতার কথা জানতে পারি। পুরাকালের প্রচলিত কাহিনী, কিংবদন্তী-

গুলিও আমাদের সেই সময়ের মানুষদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে সাহায্য করে।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন যুগের গ্রাম, নগর ও সভ্যতার থেকে তখনকার ইতিহাস জানা যায়। উদাহরণস্বরূপ আমরা সিন্ধু-সভ্যতার কথা বলতে পারি। সিন্ধু সভ্যতার নগর, বাড়ীঘর ও তখনকার মানুষের ব্যবহৃত তৈজসপত্র দেখে এই যুগের মানুষের জীবনযাত্রার সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে মিশরে ক্রীটের বা অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে আমরা সেই সব সভ্যতার কথা জানতে পারি। আবার প্রাচীন লিপি থেকে যেমন অশোকের ধর্মলেখ থেকে সুদূর অতীতের কথা জানা যায়।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) ইতিহাস কি ?

(খ) নাগরিক সভ্যতা কাকে বলে ?

(গ) প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান কি ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ধরনের প্রশ্ন :

১। আমরা ইতিহাস পড়ি কেন ?

২। অতীতের ঘটনা আমরা কিভাবে জানতে পারি ?

৩। প্রাগৈতিহাসিক যুগ কাকে বলে ?

৪। প্রাগৈতিহাসিক যুগের উপাদানগুলি কি কি ?

৫। প্রাচীন লিপি মুদ্রা থেকে আমরা কি জানতে পারি ? কত রকমের লিপি আছে ?

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। কীভাবে আমরা প্রাচীন কালের মানুষের কথা জানতে পারি ?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) মানুষ—কথা শুনতে ভালবাসে।

(খ) মানুষের কাহিনী নিয়েই—।

(গ) — থেকে এল নাগরিক সভ্যতা।

২

আদিম মানুষ

[**প্রথম পাঠ ঃ** ● সূচনা ● আদিম মানুষ ● আগুনের ব্যবহার]

আদিম মানুষ ছিল যাযাবর। তারা ঘর তৈরী করতে জানত না, কাপড় বুনতে জানত না, আগুন জ্বালাতে জানত না, কৃষি কাজের কোন ধারণাই তাদের ছিল না, বনে জঙ্গলে বন্য প্রাণীদের মত জীব-জন্তুর পাশাপাশি বসবাস করত। ক্ষুধার তাড়নায় ও আত্মরক্ষার জন্য বন্য পশুপক্ষী শিকার করে তাদের কাঁচামাংসই খেত।

এ ছাড়া তারা গাছের ফলমূল খেয়েও জীবনধারণ করত। বন থেকে মধু সংগ্রহ করত, জলাশয় থেকে মাছ শিকার করত। একই জায়গায় অনেকদিন থাকলে খাবার যোগাড় করা শক্ত হয়ে উঠত বলে আদিমযুগের মানুষরা খাদ্যের খোঁজে বেরিয়ে পড়ত অন্য কোন স্থানে।

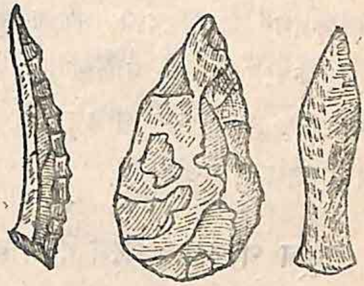
আগুনের ব্যবহার ঃ প্রখ্যাত বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের মতে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত দেখে মানুষ আগুনের কথা জেনেছিল। অনুমান করা হয়ে থাকে যে প্রায় তিন লক্ষ বছর আগে আদিম মানুষ আগুন জ্বালাতে শেখে। চীন দেশে পিকিং-এর কাছে 'চাওকাও-তিএন' নামে একটা গুহায় কিছু পোড়া কঙ্কাল পাওয়া যাওয়ায় মনে করা হয় এই পিকিং-এর লোকই প্রথম আগুন জ্বালিয়েছিল। এই সময় চকমকি পাথরের সাহায্যে আগুন জ্বালান হ'ত। আগুন জ্বালাতে শিখে ও আগুনকে নানাকাজে লাগাতে শিখে মানুষ সভ্যতার পথে দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগল।

পুরাতন পাথরের যুগ

[**দ্বিতীয় পাঠ ঃ** ● নানাপ্রকার যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন ও ব্যবহার]

আদিম মানুষ যে সময় শুধুমাত্র পাথরের ব্যবহার জানত সেই সময়কে বলা হয় পাথরের যুগ। এই যুগকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এদের বলা হয় 'পুরাতন পাথরের যুগ' ও 'নতুন পাথরের যুগ'।

পুরাতন পাথরের যুগে মানুষ পাথর ছাড়া অন্য কোন রকম ধাতুর ব্যবহার জানত না। এদের প্রধান অস্ত্রও ছিল পাথরের। বন্য পশু শিকার ও তাদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য তখনকার মানুষ পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করত। হাতিয়ার বলা হ'লেও মনে রাখা দরকার যে, এগুলি তৈরী করা হ'ত না; হাতের কাছে দরকারের সময় যা পেত সেটাকেই হাতিয়ারের মত কাজে লাগাত।



পুরাতন পাথরের যুগের হাতিয়ার

এই পাথরের টুকরোগুলো ছিল অসমান, এব্ড়ো-থেব্ড়ো ও ভোঁতা। কিন্তু কালক্রমে পুরাতন পাথরের যুগ এক লক্ষ বছর আগে শুরু হয়েছিল বলে মনে করা হয়। তার আগের মানুষ আত্মরক্ষা করতে পাথরকে এত ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতে শেখেনি। পুরাতন পাথরের যুগে মানুষ কৃষিকাজ জানত না।

নতুন পাথরের যুগ

[তৃতীয় পাঠ: সূচনা ● নতুন অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতির উৎকর্ষ বৃদ্ধি ● কৃষির সূচনা।]

সূচনা: পুরাতন পাথরের যুগের পরেই আরম্ভ হয় নতুন পাথরের যুগ। পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন যে পৃথিবীর সভ্য দেশগুলোতে পুরাতন পাথরের যুগ শেষ হয়েছে খ্রীষ্ট জন্মের আট থেকে দশ হাজার বছর আগে। এর পরেই শুরু হয়েছে নতুন পাথরের যুগের।



নতুন পাথরের যুগের হাতিয়ার

আদিম মানুষ যে সময় উন্নত ধরনের পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করতে শিখল সে সময়কে বলা হয় নতুন পাথরের যুগ। কালক্রমে বন্য মানুষ আত্মরক্ষা ও শিকারের জন্য পাথরের টুক্রোগুলোকে ঘষে-মেজে করে তুলল আরও উন্নত। এগুলোকে মসৃণ ও আরও ধারাল করে তৈরী করল।

দা, কুড়াল প্রভৃতিতে গাছের ডাল বা হাতের হাতল পরিয়ে সেগুলো হয়ে উঠল আরও উন্নত।

কৃষিকাজ ঃ নতুন পাথরের যুগে মানুষ কৃষিকাজ শিখেছিল। যাযাবর মানুষ এতকাল খাবারের খোঁজে ঘুরে বেড়াত। পুরুষরা যখন পশুচারণ আর শিকারে যায় মেয়েরা তখন ফলমূল জোগাড় করে। মাটি থেকে যেসব ফসল নিজে থেকে গজায় তার থেকে খাদ্য সংগ্রহ করা সহজ। এইসব ফসলের বীজ মাটিতে পুঁতে মানুষ যথাসময়ে ফসলও পেল। আশা বেড়ে গেল, ক্রমে লাঙ্গল দিয়ে চাষ শুরু হ'ল, এল কৃষি-বিপ্লব। এগিয়ে চলল সভ্যতার রথ।

নতুন পাথরের যুগে বৈপ্লবিক পরিবর্তন

[**চতুর্থ পাঠ ঃ** ● পশুপালন ● মৃৎশিল্পের আবিষ্কার ● বস্ত্রবয়ন ● পাথরের তৈরী সুরক্ষিত বাসগৃহ ● যানবাহন ● সমাজ জীবনের সূচনা ● শিল্প ● (গুহাচিত্র) ● ধর্মবিশ্বাস ● ভাষা।]

পশুপালন ঃ নতুন পাথরের যুগে মানুষ শুধু পশু শিকারই করত না তার সঙ্গে সঙ্গে শিখল পশুপালন করবার কায়দা। পশুকে মেরে তার থেকে আত্মরক্ষা করা আর খাওয়া ছাড়াও মানুষ বুঝতে শিখল যে কৃষিকাজ ও অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য পশুপালনও দরকার। নতুন পাথরের যুগে দেখা গেছে মেয়েরাই বেশীর ভাগ কৃষিকাজ করত আর পুরুষেরা শিকার করত। গম আর বার্লির শস্যক্ষেত্রের কাছাকাছি বহু বন্য ভেড়া, ছাগল, গরু আর শুয়োর দল বেঁধে বাস করত। কৃষিকাজ করবার সময় প্রায়ই তখনকার মানুষেরা এদের দেখতে পেত এবং এইসব পশুদের অভ্যাসগুলোও কিছু কিছু বুঝে উঠেছিল। ক্রমে ক্রমে মানুষ এদের না মেরে ফেলে পোষ মানানোর চেষ্টা করল। সংস্কৃতে পশ্ মানে বাঁধা। পশু শব্দটা পশ্ বা ফাঁস থেকে এসেছে। লতাতন্তু দিয়ে দড়ি বানিয়ে ফাঁস দিয়ে এরা গরু ছাগল ভেড়া ধরে পোষ মানাত। গরু ছাগল থেকে দুধ, ভেড়ার লোম আর চামড়া থেকে শীতবস্ত্র সবকিছুর প্রয়োজনীয়তা তারা বুঝতে শিখল এবং তার ব্যবহার করতে লাগল।

মাটির তৈরী বাসন ঃ নতুন পাথরের যুগে সভ্যতার আর একটি নিদর্শন হচ্ছে মাটির তৈরী বাসন। কোন কিছু সঞ্চয় করে রাখবার জন্য বা রান্না করার জন্য যে পাত্রের দরকার সেটা তখনকার মানুষ আস্তে আস্তে বুঝে উঠেছিল। মাটির তৈরী বাসনে খাবার জল, বনের মধু, মাঠের শস্য সবই মজুত করে রাখা যায় আবার তাতে রান্নার কাজও চলে। বলা যেতে পারে মাটির বাসনই হচ্ছে মানুষের প্রথম প্রচেষ্টা—রাসায়নিক পদ্ধতিতে উত্তাপের সাহায্যে নরম মাটি থেকে জল বের করে শক্ত মাটির বাসন তৈরী করা। এর পর একজন কাঠ থেকে কুমোরের চাক তৈরী করল।

যে মাটির পাত্র করতে হাতে অনেক বেশী সময় লাগত সেই কাজই এই চাকের সাহায্যে অতি দ্রুত হতে লাগল।

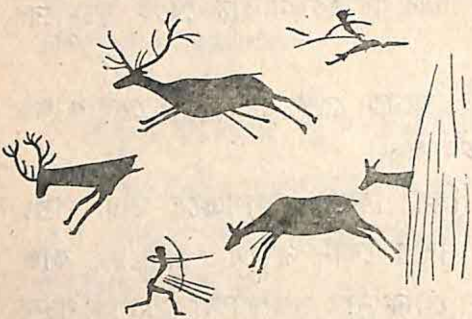
বস্ত্র-বয়ন ঃ আদিম মানুষ ছিল বিবস্ত্র। কালক্রমে তারা পশুর চামড়া, গাছের ছাল, পাতা ইত্যাদি দিয়ে কোন রকমে পোষাকের কাজ চালিয়ে নিত। শীতপ্রধান অঞ্চলের লোক নরম পশুলোমের পোষাক পছন্দ করত। ক্রমশঃ মানুষ তুলার সন্ধান পেল। তুলা থেকে সূতী কাপড় তৈরী হ'ল। কাপড় বুনতে ও পরতে শিখে আদিম মানুষ হয়ে উঠল সভ্য।

বাসগৃহ ঃ আদিম মানুষ রোদ, ঝড়-বৃষ্টিতে ভিজত, জীবজন্তুর সঙ্গে বাস করত। আত্মরক্ষার জন্য ক্রমে তারা পাহাড়ের গুহায় আস্তানা গাড়ল। ফলে বহুকাল মানুষকে গুহামানবের জীবনযাপন করতে হয়েছে। যারা গুহায় বাস করত তারা ক্রমে পাথরের টুকরো পর পর সাজিয়ে ঘর বাঁধতে শিখল। এইসব পাথরের ঘর অনেক নিরাপদ কারণ এতে বাস করে কেবল জল ঝড় নয়, বন্য জন্তু আর শত্রুর-হাত থেকেও আত্মরক্ষা করা যায়। কোন কোন জায়গায় হ্রদ জলাশয়ের উপরে গাছের ডালপালা বা লতাপাতা দিয়ে চালাঘরের মত বাসা তৈরি হ'ত।

যানবাহন ঃ আদিম মানুষ যাতায়াত করত পায়ে হেঁটে। মানুষ যখন পশুকে বশ করতে শিখল তখন তাদের পিঠের উপর বোঝা চাপিয়ে দিল। এইভাবে গরু, গাধা, উট এইসব ভারবাহী জন্তু মানুষের একস্থান থেকে আর একস্থানে যাওয়া আর আসা সহজ করল। কিছুকাল পরে

মানুষ চাকা বানাল, সে দেখল, যে জন্তু বশ মেনেছে তাকেই চাকার গাড়ী টানতে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। নদীতীরে বা জলের ধারে যারা বাস করত তারা বাঁশ বা কাঠের গুঁড়ি দিয়ে ভেলা বা ডোঙ্গা বানিয়ে মাছ ধরত বা জলপথে যাতায়াত করত। এখন মানুষ দলবদ্ধভাবে বাস করে, জাল বোনে, মাছ ধরে, চাষ করে, ফলে গ্রামের পত্তন হয়েছে, এইভাবে ধীরে ধীরে পরিবার, গোষ্ঠী, পল্লী, নগর ও রাষ্ট্রের সূত্রপাত হয়।

গুহাচিত্রে শিল্প ও চিন্তার প্রতিফলন ঃ নতুন পাথরের যুগে মানুষের মধ্যে শিল্পী-মনের পরিচয় পাওয়া যায়, যেসব গুহায় তারা বাস করত তার দেওয়ালে বা গায়ে কোথাও কোথাও শক্ত জিনিস দিয়ে জীবজন্তু বা মানুষের বহু রং-এর চিত্র আঁকত। এসব চিত্র থেকে তখনকার জীবজন্তু, শিকার কাহিনী ও জীবনযাত্রার নমুনা পাওয়া যায়। ইউরোপের স্পেনদেশের আলতামিরার গুহাচিত্র এর-মধ্যে বিশেষভাবে পরিচিত।



গুহাচিত্র

মাতৃকা-পূজা ঃ মানুষের জীবনযাত্রার সমস্যার অন্ত নাই। এইসব সমস্যার মধ্যে প্রধান হচ্ছে খাদ্য সংগ্রহ করা। আর এই খাদ্যের সমস্যা সমাধান করতে মাটির উপর নির্ভর করতে হয়। তাই মাটিই তাদের মাতা, মাটিই তাদের বিধাতা, মাটিই তাদের অন্নদায়িনী, কৃষিনির্ভর, মানবসভ্যতায় ধরিত্রী তাই দেবী, জন্ম ও মৃত্যুর, জয় ও পরাজয়ের, উত্থান ও পতনের প্রতীক। উৎপাদনের প্রধান অবলম্বন, শস্যশালিনী মাটির সঙ্গে ধরিত্রী-মাতার যোগ আছে। অতএব মাতৃকা-পূজার প্রচলন হয়েছিল। কোন কোন প্রাচীন সভ্যতায় মাতৃকা-মূর্তির সঙ্গে ষাঁড়ের প্রতিকৃতিও পাওয়া যায়। সিন্ধুসভ্যতায় এইরূপ মাতৃকা পূজার প্রচলন দেখা যায়।

ভাষা ঃ কথা বলা থেকে সভ্যতার শুরু। আদিম মানুষ পশুর মত হাঁকডাকের মারফতে ভয়, দুঃখ বা আনন্দ প্রকাশ করত। ক্রমে মানুষ

নানা শব্দের সাহায্যে নানা জিনিস বোঝাতে শিখল। এখন থেকে শুরু হ'ল ভাষায় মনের ভাবের লেনদেন আর এই ভাবের লেনদেন যোগাল চিন্তার খোরাক। ভাষা ও ভাবের আদান-প্রদান মানুষে মানুষে যোগসূত্র সৃষ্টি করল।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

(ক) আদিম যুগের মানুষ কোথায় বাস করত এবং কি খেয়ে জীবনধারণ করত ?

(খ) আদিম যুগে কারা প্রথম আগুন জ্বালাতে শিখেছিল ?

(গ) পুরাতন পাথরের যুগের মানুষ কি ধরণের হাতিয়ার ব্যবহার করত ?

(ঘ) পুরাতন পাথরের যুগ কখন শেষ হয়েছে ?

(ঙ) কোন যুগে মানুষ প্রথম খাদ্য উৎপাদন এবং পশুপালন করতে শেখে ?

(চ) মৃৎশিল্পের আবিষ্কার কখন হয় ?

(ছ) আদিম মানুষ কি কি জিনিস দিয়ে পোশাকের কাজ করত ?

(জ) নতুন পাথরের যুগে মানুষ কিভাবে ঘরবাড়ি তৈরি করত ?

(ঝ) আলতামিরা কোথায় অবস্থিত ? আলতামিরা কি জন্য বিখ্যাত ?

(ঞ) কিভাবে ভাষার সৃষ্টি হল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ধরণের প্রশ্ন ঃ

১। আদিম যুগের মানুষের জীবন-যাপন প্রণালী সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। আদিম যুগের মানুষ কি ভাবে আগুনের কথা জানতে পারে ? আজ থেকে কতদিন আগে মানুষ আগুনের ব্যবহার জানত ? পিকিং মানুষ যে আগুনের ব্যবহার জানত তার প্রমাণ কি ?

৩। পাথরের যুগ কাকে বলে ? একে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে ? কি কি ?

৪। পুরাতন পাথরের যুগের অস্ত্রশস্ত্রগুলি কেমন ছিল ?

৫। নতুন পাথরের যুগ কখন শুরু হয়েছিল ? এই যুগের অস্ত্রশস্ত্র কেমন ছিল ?

৬। নতুন পাথরের যুগের কৃষিবিপ্লব সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৭। নতুন পাথরের যুগকে বিপ্লবের যুগ বলা হয় কেন ?

৮। নতুন পাথরের যুগের কয়েকটি প্রাণীর নাম বল।

৯। কিভাবে মৃৎশিল্প উদ্ভাবন করা হয় ? মাটির পাত্র কি কি কাজে ব্যবহার হত ?

১০। নতুন পাথরের যুগে বস্ত্রবয়ন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

১১। প্রাচীন মানুষ বন্য পশু, ঝড়-বৃষ্টি থেকে বাঁচবার কি উপায় অবলম্বন করেছিল ?

১২। নতুন পাথরের যুগে এক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চল থেকে কি মালপত্র আনা নেওয়া করত ?

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষের সম্বন্ধে কি জান ?

২। নতুন প্রস্তর যুগের তিনটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা পশুপালন, মৎস্য শিকার ও কৃষিকার্য বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৩। নতুন প্রস্তর যুগের মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪। নতুন পাথরের যুগের সমাজে কি ভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের সূচনা হয় আলোচনা কর।

৫। নতুন পাথরের যুগ কি ভাবে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল ? উদাহরণ সহযোগে বিষয়টি আলোচনা কর।

৬। নতুন পাথরের যুগের মানুষের ধর্মবিশ্বাস কেমন ছিল ? এই যুগে কি ভাবে মাতৃকা-পূজার প্রচলন হয়েছিল ?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(ক) আদিম মানুষ কি — ।

(খ) — যুগে মানুষ কৃষিকাজ জানত না।

(গ) পুরাতন পাথরের — বছর আগে শুরু হয়েছিল ?

(ঘ) পুরাতন পাথরের যুগের পরেই আরম্ভ হয় — যুগ।

(ঙ) — মানুষ ছিল বিবস্ত্র।

(চ) — গুহাচিত্র এর মধ্যে বিশেষ ভাবে পরিচিত।

২। বন্ধনীর মধ্যে যে সব শব্দ আছে তার থেকে সঠিক শব্দটি নির্বাচন করে শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(ক) মানুষ প্রথম আগুনের কথা — জানতে পেরেছিল (আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, বনের দাবানল, চকমকি পাথর)।

(খ) পুরাতন পাথরের যুগে মানুষের প্রধান অস্ত্র ছিল — (কাঠের, পাথরের, লোহার)।

(গ) নতুন পাথরের যুগে বেশীর ভাগ কৃষিকাজ করত — (পুরুষেরা, মেয়েরা)।

(ঘ) আদিম মানুষ আত্মরক্ষার জন্য — আস্তানা গাড়ল — (গাছের উপর, পাহাড়ের গুহায়, নৌকায়)।

৩ তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ

[সূচনা ● ধাতুর ব্যবহার ● উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন ● শিল্প ও কারিগরী দক্ষতা ● বাণিজ্য ও জিনিসপত্রের লেনদেন ● সমাজ জীবনে পরিবর্তনের সূচনা ● গোষ্ঠী বিরোধ ও রাষ্ট্রের উদ্ভব ● নদী-উপত্যকায় সভ্যতা গড়ে ওঠার কারণ।]

সূচনা ঃ মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রস্তরযুগের পরেই আসে ধাতুর যুগ। মানুষ একদিন পোড়ামাটি থেকে তামার চুর পেল। এই তামার ব্যবহার যে যুগে শুরু হয় তাকে তাম্রপ্রস্তর যুগ বলা হয়। তামার পর পেল রাঙ্ বা টিন। দুটোতে মিশিয়েও দেখল, ব্রোঞ্জ নামে বেশ শক্ত মজবুত ধাতু তৈরী হ'ল। শুরু হ'ল ব্রোঞ্জযুগ। মানুষ ইতিমধ্যে অনুকূল পরিবেশে নদীতীরে খাদ্য উৎপাদনে মন দিয়েছে, চাষীরা ক্ষেতখামার গড়ে গ্রামের পত্তন করেছে। আর যারা চাষের উপযুক্ত পরিবেশ পায়নি তারা সমুদ্রতীরে বা চলাচলের পথে অথবা দ্বীপে নতুন বাসস্থান গড়ে তুলেছে। এইসব লোকেরা পণ্যের বণ্টনে এবং বিনিময়ে অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দিয়েছে, ফলে শহর আর বন্দরের পত্তন হয়েছে।

উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঃ পশুচারণ থেকে কৃষি এবং কৃষি থেকে শিল্প মানুষের ইতিহাসে ধাপে ধাপে অগ্রগতি এনে দিয়েছে। কৃষির ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং লোকসংখ্যাও বেড়ে চলেছে। শুধু লোকই বাড়েনি মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে শ্রম বাঁচানোর নানা উপায় আবিষ্কার করেছে। যেমন কপিকলে ভারী ভারী জিনিস তোলা, লাঙ্গলে বলদ জুড়ে চাষ করা, বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরা, কুঠার দিয়ে গাছ কাটা ইত্যাদি। শীত বর্ষা গ্রীষ্মের হাত থেকে বাঁচবার জন্য আগে মানুষ গাছের ছাল পরত। তারপর কবে কোথায় গাছের ছালে আঁশাল সূতো পাওয়া গেল তা ঠিক জানা যায় না। তারপরে এল তকলি, চরকা আর তাঁত।

শিল্প ও কারিগরী দক্ষতা ঃ নানা জিনিস এখন তৈরী হতে শুরু করল। সকলে সব জিনিস তৈরী করতে পারে না। কেউ হয়ত ভাল কুমোর, মাটির তাল থেকে নানা রকমের পাত্র তৈরী করছে। আবার কেউ কেউ

কাঠের কাজে দক্ষতা দেখাচ্ছে, নৌকা বানাচ্ছে। আবার কেউ বা মাছ ধরে, কেউবা বর্শা বা তীর বানাচ্ছে। নানা জনে নানা জিনিস বানাচ্ছে। এইভাবে কারিগরী ও শিল্পে দক্ষ মানুষের সৃষ্টি গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন পাড়ায় কোথাও কুমোর, কোথাও জেলে, কোথাও তাঁতী, কোথাও চাষী বাস করতে লাগল।

বাণিজ্য ও জিনিসপত্রের লেনদেন : এবার শুরু হ'ল নিজের তৈরি পণ্যের বিনিময়ে নিজের প্রয়োজন মেটান। এই বিনিময়-ব্যবস্থা থেকেই বাণিজ্যের শুরু। এই বাণিজ্য গ্রামে বা নগরে সীমাবদ্ধ থাকল না, দেশ-বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ল। যেমন মিশর ও মেসোপটেমিয়া তামা আমদানি করত—সুদূর খোরাসান, স্পেন ও আয়ারল্যাণ্ড থেকে। আয়ারল্যাণ্ড আবার স্পেন থেকে আনত সোনা ও টিন। এই বাণিজ্যিক যোগসূত্রের মাধ্যমে ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল। এই সময় মুদ্রার মত বিনিময়ের কোন মাধ্যম ছিল না। জিনিসের বদলে অন্য জিনিস দিয়ে বাণিজ্যিক লেনদেন চলত।

সামাজিক জীবনে পরিবর্তনের সূচনা : তাম্রব্রোঞ্জ যুগের অগ্রগতি মানুষের জীবনে পরিবর্তন এনেছিল। চাষবাস করা ঘরে থাকা মানুষ আর ঘুরে বেড়ান যাযাবর মানুষের মধ্যে অনেক তফাৎ। এখন ঘরে থাকা মানুষ অনেক রকমের জিনিস তৈরি করতে শিখল। মানুষ বিভিন্ন জিনিস পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান করতে শিখল। শুরু হল বিনিময় আর বণ্টন। মানুষ হ'ল সঞ্চয়ী। পত্তন হ'ল নগরের। এখন সকলের সম্পত্তি সকলের নয়। বরং প্রত্যেকের আলাদা আলাদা সম্পত্তি হ'ল। যে যা কাজ করে সেই অনুযায়ী মানুষ বিভক্ত হ'ল। যুদ্ধ-বন্দীদের এখন ক্রীতদাস করা হ'ল। এর থেকে এল দাস প্রথা। যারা দুর্বল তাদের উপর সকলের প্রাধান্য হ'ল। মানুষে মানুষে সম্পত্তি অনুসারে বড় ছোট হ'ল। ফলে উঁচুজাত, নীচু জাত, ধনী, দরিদ্র এইভাবে শ্রেণীবিভাগ শুরু হ'ল।

গোষ্ঠীবিরোধ ও রাষ্ট্রের উদ্ভব : মানুষ চায় শান্তি, ভাল চাষের বা পশুচারণের জমি বা শিকারের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এই নিয়ে বিরোধ শুরু হ'ল আবার অনেক সময় এই বিরোধের ফলে

যে দাঙ্গা, লুটপাট বা মারামারি হ'ল তার থেকে প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিতে লাগল। দাসপ্রথা, শ্রেণীবিভাগ সম্পত্তির লোভ, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে লড়াই-এর সূত্রপাত হ'ল। সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজন যুদ্ধের আর যুদ্ধের জন্য দরকার শৃঙ্খলা, আবার গোষ্ঠী বা উপজাতির মধ্যে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের জন্য দরকার নিয়মকানুন। এইসব নিয়মকানুন ও শৃঙ্খলা চালু করার জন্য আর যুদ্ধক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য চাই নেতা। এই নেতা থেকে সৃষ্টি হল রাজার। রাজা গ্রাম-নগর রক্ষা করেন, লুটেরার হাঙ্গামা সামলান; তাই লোকে খুশি হয়ে তাঁকে কর দেয়। ক্রমেই তাই শুরু হয় রাষ্ট্র।

নদী উপত্যকায় সভ্যতা গড়ে ওঠার কারণঃ মানুষ খাদ্যের সন্ধানে যখন ঘুরে বেড়াত তখন সে ছিল যাযাবর, কিন্তু যখন সে চাষবাস শিখল তখন আরও ভাল চাষের জমি অনুকূল পরিবেশের মধ্যে খুঁজতে লাগল। যেখানে জল নাই, অথবা যে জায়গা জলে ডোবা সেখানে চাষের বড় অসুবিধে। কর্কশ পাথুরে জমি বা গভীর বন অথবা অতিবৃষ্টির দেশে গ্রাম বা নগর পত্তন করার অসুবিধে, তাই মানুষ খুঁজতে লাগল রোদে ঝলমল সুজলা সুফলা-নদীতীরবর্তী স্থান। এই সব স্থানে খাল কেটে নদী থেকে জল এনে চাষের বড়ই অসুবিধে। এই জন্য বুদ্ধিমান পরিশ্রমী মানুষ নদীর ধারে ধারে বসতি গড়ে তুলেছিল। তাই নীলনদ, তাইগ্রীস, ইউফ্রেটিস, ইয়াং-সিকিয়াং, হোয়াংহোর তীরে তীরে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। নদী-তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে মানুষ অনুকূলস্থানের সন্ধান পেল। আর সব অনুকূলস্থানেই মানুষের বুদ্ধি ও পরিশ্রমের ফলে পৃথিবীর প্রথম সভ্যতা গড়ে উঠে। এইসব সভ্যতার মধ্যে অন্যতম পীঠস্থান হচ্ছে সিন্ধু-গঙ্গা-যমুনাবিধৌত ভারতভূমি।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) তাম্র-প্রস্তর যুগ কাকে বলে ?

(খ) ব্রোঞ্জ-যুগ কি ভাবে শুরু হয় ?

(গ) বিনিময় প্রথা কি ?

(ঘ) বাণিজ্যের শুরু কি ভাবে হয় ?

(ঙ) নগরের পত্তন কি ভাবে হয় ?

(চ) গোষ্ঠী সংগ্রামের কারণ কি ?

(ছ) রাষ্ট্রের উদ্ভব কি ভাবে হয় ?

(জ) তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে কোথায় কোথায় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ধরনের প্রশ্ন :

১। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ কাকে বলে ? এই যুগের বৈশিষ্ট্য কি ?

২। তাম্র-ব্রোঞ্জ থেকে কি ভাবে উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছিল ?

৩। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের সমাজে কি ভাবে কারিগর ও দক্ষ শিল্পীর সৃষ্টি হয়েছিল ?

৪। তাম্র-বোঞ্জ যুগের বাণিজ্যপ্রথা আলোচনা কর।

৫। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে কি ভাবে সমাজ জীবনে পরিবর্তন এসেছিল।

৬। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৭। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের গোষ্ঠী-সংগ্রাম আলোচনা কর।

৮। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে নদী উপত্যকায় সভ্যতা গড়ে ওঠার কারণ আলোচনা কর।

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ কাকে বলে ? এই যুগে শহরের আবির্ভাব, উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন অথবা সমাজ জীবনে পরিবর্তন, গোষ্ঠী সংগ্রাম এবং রাষ্ট্রের সূচনা আলোচনা কর।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। সঠিক উত্তরটিতে ✓ দাগ দাও :

(ক) তামার সঙ্গে লোহা ▭ রূপা ▭ পাথর ▭ টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরী হয়।

(খ) প্রথম দাস প্রথা দেখা গেল—
পুরাতন প্রস্তর যুগে ▭ তাম্রব্রোঞ্জ যুগে ▭ নতুন পাথরের যুগে।

২। হ্যাঁ অথবা না লিখ :—

(ক) মানুষ একদিন পোড়ামাটি থেকে তামার চুর পেল।

(খ) শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আগে মানুষ পশুর চামড়া পরত।

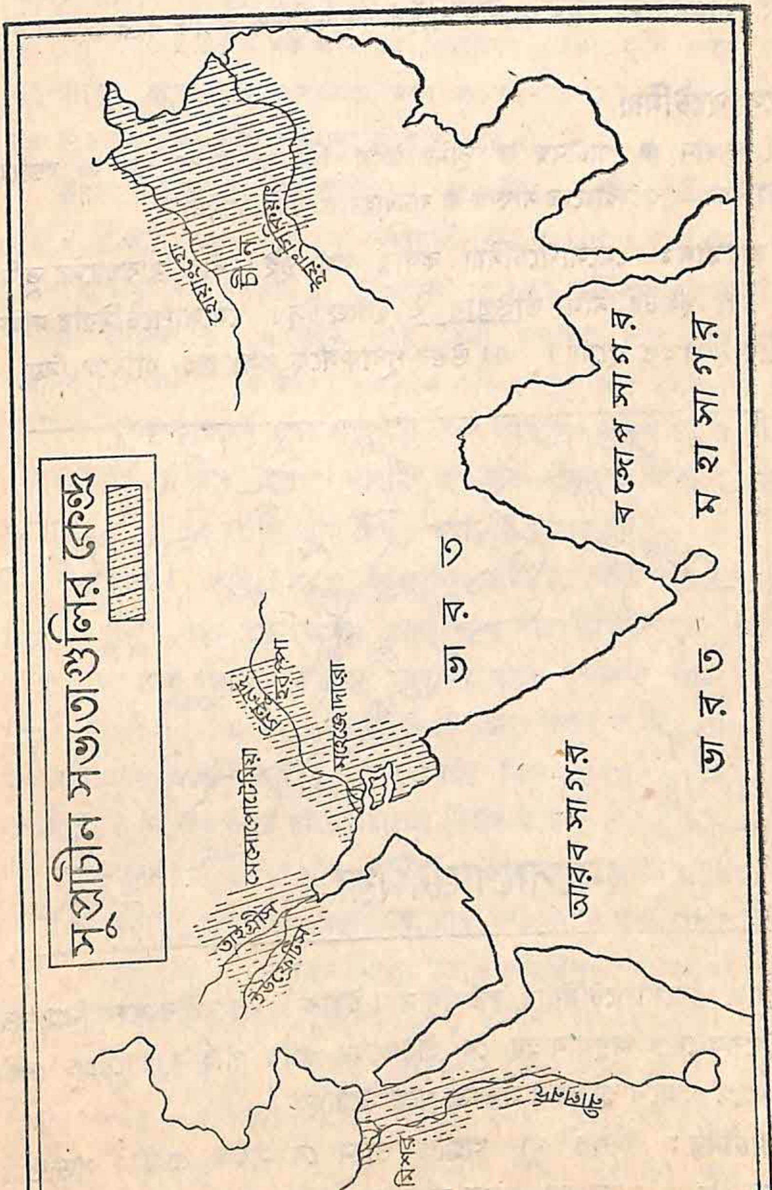
(গ) তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে মুদ্রার মত বিনিময়ের কোন মাধ্যম ছিল না।

(ঘ) রাজা গ্রামনগর রক্ষা করেন, লুটেরার হাঙ্গামা আগলান, তাই লোকে খুশী হয়ে তাঁকে কর দেয়।

পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতা

৪

পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন নদীর পলিমাটি ভরা



অঞ্চলে। এদের মধ্যে তাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী মেসোপটেমিয়াতে, নীলনদের তীরবর্তী মিশরে সভ্য মানুষের পদচিহ্ন পড়েছিল। আবার নদীমাতৃক ভারতের সিন্ধুনদের তীরে সিন্ধুসভ্যতা ও হোয়াংহো ও ইয়াং সিকিয়াং নদীতীরে প্রাচীন চীনের সভ্যতা বিস্তারলাভ করে।

মেসোপটেমিয়া

[অবস্থান ● প্রাচীনত্ব ● ভূমির উর্বরা শক্তি ● উৎপন্ন শস্য ● বন্যারোধ উপজীবিকা ● সুমেরীয়দের সাফল্য ● যানবাহন ও ব্যবসাবাণিজ্য]

অবস্থান ঃ মেসোপটেমিয়া কথার অর্থ দুই নদীর মাঝখানের ভূমি। এই নদী দুইটির নাম তাইগ্রাস ও ইউফ্রেটিস্। মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণ ভাগকে বলা হত সুমের। এর উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে বলা হত বাবিলোনিয়া ও



আক্কাদ, মেসোপটেমিয়ার বর্তমান নাম ইরাক। সুমেরীয় শহর নিপ্পুরের ধ্বংসাবশেষ দেখে অনুমান হয় যে খ্রীষ্টজন্মের প্রায় পাঁচ হাজারেরও বেশী বছর আগে এখানে সুমেরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

প্রাচীনত্ব ঃ মিশর বা অন্যান্য স্থানে যে সকল প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে অনুমান করা হয় যে লেখার পদ্ধতি, রথের

চাকা বা এমনি গাড়ীর চাকা সম্ভবতঃ সুমের থেকে মিশরে এসেছিল। তামার ব্যবহার সম্ভবতঃ পশ্চিম এশিয়ায় প্রথম শুরু হয়েছিল। আবার মিশর দেশে মেসোপটেমিয়ার স্থাপত্য শিল্পের প্রভাব পড়েছিল। মেসোপটেমিয়ার উর নামক জায়গায় শিল্পীদের তৈরী মূর্তি দেখে শিল্পীরা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। সেইজন্য মনে হয় সুমেরের সভ্যতা মিশরের আগে শুরু হয়েছিল কিন্তু সকলে একথা স্বীকার করে না।

ভূমির উর্বরতা ও উৎপন্ন দ্রব্য ঃ তাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস্ নদী দুটি হাজার হাজার বছর ধরে যে পলিমাটি বয়ে এনেছে তাতেই তৈরী হয়েছে মেসোপটেমিয়ার সমভূমি। তাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিসের পলিমাটি জমে পারস্য উপসাগরে যে নতুন ভূমি তৈরী হয়েছিল তার নাম সুমের। এখানকার পলিমাটি খুব উর্বর। এখানে নদী থেকে জল সেচনের সুবিধে আছে। সেই কারণেই এসব জায়গায় প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হয়।

মেসোপটেমিয়ার প্রধান প্রধান কৃষিজাত ফসল ধান, ভুট্টা, খেজুর ও তামাক। পৃথিবীর আশি ভাগ খেজুর এখানেই উৎপন্ন হয়।

বন্যারোধ ঃ তাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীতে প্রতি বছরেই বন্যা দেখা দিত। বন্যার সময় লোকেদের দুঃখদুর্দশার সীমা থাকত না। এখানকার অধিবাসীরা তাই বন্যার হাত থেকে ঘরবাড়ী, ফসল বাঁচাবার জন্য উঁচু বাঁধ তৈরী করেছিল। এ ছাড়া খাল কেটে বন্যার জল বের করে দেওয়া হ'ত। জল সরবরাহ সম্বন্ধে রাজাদের কঠোর নিয়ম নিষেধ ছিল। ক্ষেতে ক্ষেতে জলকাটা ও নিকাশ নিয়ে রাজ্যে রাজ্যে বিবাদ ঘটত।

উপজীবিকা ঃ দেশবাসীর অধিকাংশ চাষ বাস ক'রে জীবিকা নির্বাহ করত। এছাড়া পশুপালন, মধুসংগ্রহ, মাছ ধরা ও ব্যবসা-বাণিজ্যেতে বহু লোক নিযুক্ত ছিল। বহুরকম শিল্পের উন্নতি হয়েছিল। যেমন বস্ত্র, চামড়া, ইট তৈরী শিল্প ইত্যাদি। সোনা, রূপা, হাতির দাঁতের তৈরী অলংকার এবং তামা, ব্রোঞ্জ ও পাথরের জিনিসপত্র তৈরী করেও বহুলোক জীবিকা নির্বাহ করত। ক্রীতদাস প্রথা ছিল। ধনী দরিদ্র, মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে জনসংখ্যা বিভক্ত ছিল। পূজা অর্চনার জন্য পুরোহিত এবং রোগের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক ছিল।

সুমেরীয়দের সাফল্য ঃ মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণ দিকে সুমের অবস্থিত। এখানকার লোকেদের সুমেরীয় বলা হয়। অনুমান করা হয় যে খ্রীষ্ট পূর্ব তিন হাজার অব্দে এখানে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল।

পলিমাটিতে ইট ভাল হয়। সুমেরীয়রা কাঁচা ইট দিয়ে ঘরবাড়ী মন্দির তৈরী করত। সুমেরে ছিল ছোট ছোট রাজ্য। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত অনেক সময় দেশের রাজা হতেন। সমাজে এঁদের বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। মন্দিরের পাশে মঞ্চ থাকত। একে বলা হ'ত জিরারাত। জিরারাতের শিখর দূর থেকে দেখা যেত। আকাশকে ছোঁয়ার জন্য উঁচু থেকে আরও উঁচু হয়ে উঠত। ধনীরা যেসব প্রাসাদ তৈরী করতেন, তার ইটের দেওয়াল পরিচ্ছন্ন করে নানা রঙে রঞ্জিত করা হ'ত এইসব দেওয়ালের গায়ে আঁকা থাকত নানা ছবি, যা থেকে সুমেরীয় জীবনযাত্রা সম্বন্ধে জানা যায়।

এখানকার শিল্পীরা পাথর খোদাই করে নানারকম জিনিস তৈরি করত। সুমেরীয়রা সাধারণতঃ তামা এবং টিন এবং কখনও কখনও তামা ও টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জের ব্যবহার করত। এমনকি লোহার ব্যবহারও তারা শিখেছিল বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু ধাতুর ব্যবহারে তারা বিশেষ পটু ছিল না।

যানবাহন ও ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ যানবাহনের মধ্যে জলপথে নৌকো ও স্থলপথে দুই চাকার ও চার চাকার পশুতে টানা গাড়ীর কথা জানা যায়। কোন কোন পশুকেও ভার বহনের জন্য কাজে লাগান হ'ত। জলপথ দিয়ে ভারত থেকে পারস্য সাগরে পৌঁছান কঠিন হলেও অজানা ছিল না। অন্যদিকে স্থলপথে ভারত থেকে কাবুল, হিরাট, ইরাণের মধ্যে দিয়ে বাবিলনে যাওয়া আসা চলত।

এই যুগে ব্যবসা বাণিজ্যেরও প্রসার হয়েছিল। সুমেরীয়রা উদ্বৃত্ত শস্য, কাপড় ও চামড়ার জিনিস বিদেশে চালান দিত। আর আমদানী করত সোনা, রূপা, তামা, পাথর ইত্যাদি। ভারতের সিন্ধুনদের অধিবাসীদের সঙ্গে সুমেরীয়দের ব্যবসা বাণিজ্য চলত বলে জানা যায়।

লিপি ঃ সুমেরীয়রা চিত্রশিল্পীর সাহায্যে লিখতে জানত্। পাতলা টালির মত চৌকো পাটায় নরুণের মত শক্ত কলম দিয়ে কেটে কেটে লিখত। এই লিপিকে বলা হ'ত কীলকাক্ষর বা কোণাক্ষর—লাতিনে বলে কিউনিফর্ম। মাটির টালিগুলিকে আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করে নিত। পোড়ান হ'ত বলে পাঁচ ছয় হাজার বছর পরেও সেগুলো শক্ত আর অটুট আছে। এগুলিতে লেখা আছে সরকারী আর বেসরকারী হিসাব-নিকাশ, দলিল-পত্র ও গল্প কাহিনী।


কিউনিফর্ম

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

(ক) মেসোপটেমিয়ার বর্তমান নাম কি ?

(খ) মেসোপটেমিয়া দেশটি কোথায় অবস্থিত ?

(গ) সুমের কাকে বলে ?

(ঘ) খ্রীষ্টজন্মের কত বছর আগে সুমেরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ?

(ঙ) কোন কোন নদীর ধারে সুমেরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ?

(চ) কিউনিফর্ম লিপির আবিষ্কারক কারা ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ধরনের প্রশ্ন ঃ

১। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা কোনটি ? এই সভ্যতা কোন কোন নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল ?

২। তাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে কোন সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল ? এই সভ্যতা বিকাশে ভৌগোলিক কারণ কি ?

৩। সুমেরীয়রা কি ভাবে বন্যারোধ করত ।

৪। সুমেরীয়দের জীবনযাত্রা প্রণালীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৫। সুমেরীয় শিল্পকলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৬। সুমেরীয় ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৭। সুমেরীয়রা কিভাবে লিখত? কীলকাক্ষর বা কোণাক্ষর কাকে বলে?

৮। সুমেরীয়রা কোন কোন জিনিস বিদেশ থেকে রপ্তানি করত?

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। সুমের কোথায় অবস্থিত ছিল? সুমের সভ্যতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। সুমেরীয় সভ্যতা বলতে কি বুঝ? এই সভ্যতার বিকাশ কোন কোন নদীর তীরে ঘটেছিল? সুমেরীয়দের জীবনযাত্রা প্রণালী আলোচনা কর।

৩। স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পে সুমেরীয়দের সাফল্য আলোচনা কর।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। সঠিক উত্তরটিতে √ চিহ্ন দাও :

(ক) মেসোপটেমিয়ার বর্তমান নাম ▭ ইরান ▭ ইরাক ▭ ইস্রাইল।

(খ) প্রথম চাকাওয়ালা গাড়ী আবিষ্কার হয়েছিল—
চীন ▭ ভারত ▭ সুমের ▭ মিশর ▭

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণ ভাগকে বলা হত—।

(খ) মেসোপটেমিয়ার প্রধান প্রধান কৃষিজাত ফসল —, —, —, —।

(গ) সুমেরীয়রা — দিয়ে ঘরবাড়ি ও মন্দির তৈরী করত।

(ঘ) সুমেরীয়দের লিপিকে বলা হত —।

মিশর

[●অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি ●ফারাও ●পুরোহিত ●লিপি ● লেখক ● কর আদায়কারী ● সৈনিক ও শ্রমজীবী ●ব্যবসাবাণিজ্য ●পিরামিড ●ধর্মবিশ্বাস ●মসি ●উপজীবিকা]

অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি ঃ মানচিত্রে মিশর বলতে যে দেশটুকু দেখা যায় প্রাচীন মিশর কিন্তু তার থেকে আয়তনে ছোট। মিশরের মাঝ দিয়ে



বয়ে গেছে নীল নদ। এই নদীর দুই পাশে দশ পনের ক্রোশ বিস্তৃত জায়গাটুকু আসল মিশর—তার বাইরে দুই দিকেই মরুভূমি। নীলনদের পলি মাটিতে তৈরী, সেইজন্য এখানকার জমি খুব উর্বর। মিশরের দক্ষিণ

দিকটায় গভীর জঙ্গল। মিশরের সমতলের ভিতর দিয়ে নদীর যে অংশ বয়ে আসছে তা ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বাধাহীন। সাগরের কাছে সমতল দেশে নদীর গতি ধীর হয়ে যায়—তাই সেখানে গড়ে উঠে বিশাল ব-দ্বীপ। এই ব-দ্বীপের পূর্বদিকে সিনাই উপত্যকা, এই সিনাই দিয়েই মিশরে প্রবেশ করে এশিয়ার নানা জাতি উপজাতি।

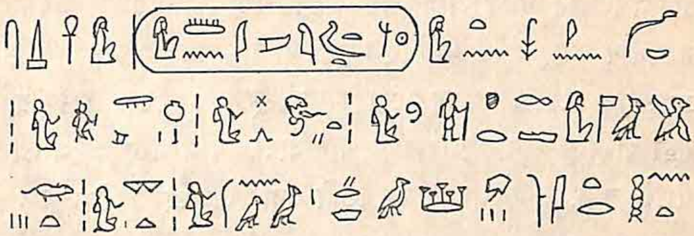
গ্রীষ্মকালে নীলনদের উপভাগে পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ফলে প্রতি বছর নীলনদে বন্যা দেখা দেয়। বন্যার সময় পলিমাটি জমা হয়। জল শুকিয়ে গেলে এই পলিমাটিতে প্রচুর শস্য জন্মায়। যদি মিশরে নীলনদ না থাকত এবং বন্যা না হ'ত তাহ'লে সারা মিশরই মরুভূমি হয়ে যেত। এই জন্য মিশরকে "নীলনদের দান" বলা হয়। প্রচুর ফসল হ'ত বলে মিশরকে বিদেশের লোক এককালে "প্রাচ্য জগতের শস্যের গোলা" বলত। মিশরের নীলনদের উপত্যকাতেই খ্রীষ্টজন্মের কয়েক হাজার বছর আগে গড়ে উঠেছিল পৃথিবীর অন্যতম আদি সভ্যতা।

ফ্যারাও : মিশরের রাজারা মিশরীয় ভাষায় "ফ্যারাও" নামে পরিচিত। ফ্যারাও শব্দের অর্থ "বড় বাড়ী" অর্থাৎ যিনি বড় বাড়ীতে বাস করেন তিনিই ফ্যারাও বা রাজা। রাজা মেনেস ছিলেন মিশরের প্রথম ফ্যারাও। প্রাচীন মিশরের রাজা বা ফ্যারাও রাজ্যের শুধু অধীশ্বর নন, সমাজেরও মাথা। দেবতার ন্যায় তিনি পূজা পান। তার উদ্দেশ্যে পর যুগে মন্দিরও নির্মিত হয়। ফ্যারাও-এর অনেক কাজ, যুদ্ধের সময় তিনি সৈন্যদের চালক, শান্তির সময় রাজদরবারে শোভা—সকলের অভিযোগ শোনেন।

পুরোহিত : মিশর দেশে পুরোহিতরা উচ্চ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের অসীম ক্ষমতা ছিল। দেবসেবা, পবিত্র প্রাণীদের দেখাশোনা প্রভৃতি ধর্ম কর্ম ছাড়াও সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা ইত্যাদির চর্চাও তাঁদের একচেটিয়া ছিল। তাঁদের রাজকর দিতে হ'ত না, তাঁরা দেবত্র সম্পত্তি ভোগ করতেন। পুরোহিতেরা মন্দির সংলগ্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতেন। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাও তাঁদের হাতে ছিল।

লিপি : প্রাচীন মিশরীয় লিখন পদ্ধতিকে বলা হয় হাইরো-গ্লিফিক।

এই কথার মানে পবিত্র লিপি। ছবি এঁকে এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করার ফলে এই চিত্রলিপির সূত্রপাত হয়। মিশরীয়রা যে শুধু এই চিত্রলিপির উদ্ভাবক, তা নয়, আমরা যে কাগজ বা 'পেপার' ব্যবহার করি তা



হাইরোগ্লিফিক

তাদের দেশের শব্দ। মিশরে পাপাইরাস নামে গাছের ছাল থেকে লেখবার কাগজ তৈরী হ'ত। পাপাইরাস থেকে 'পেপার' শব্দ এসেছে। আমরা এখন পেপার বলতে সব রকম কাগজকেই বুঝি।

লেখক ঃ প্রাচীন মিশরে লেখক সম্প্রদায় ছিল। এরা সরকারী ও বেসরকারী মুহুরীর কাজ করত। ব্যবসা বাণিজ্যের লেনদেন সংক্রান্ত, লোক গণনা ও রাজস্ব নির্ধারণ প্রভৃতি কাজে এরা ছিল পটু। দলিল দস্তাবেজ লেখা, লাভ-লোকসানের হিসাব, পণ্যের ওজন, বিক্রয় মূল্য, চুক্তিপত্র ইত্যাদি সব কিছু লেখার ব্যাপারই ছিল লেখক সম্প্রদায়ের একচেটিয়া।

কর আদায়কারী ঃ প্রাচীন মিশরে ফ্যারাওরা ছিলেন শাসন বিষয়ের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাঁদের সাহায্য করতেন উজির বা প্রধানমন্ত্রী। এই উজিরই ছিলেন প্রধান বিচারপতি ও কোষাধ্যক্ষ। মিশর দেশে তখনও মুদ্রার প্রচলন হয় নি। তাই শস্য দিয়েই সব রাজস্ব আদায় হ'ত। বেতন দেওয়া হ'ত শস্যের মাধ্যমে। কর আদায়ের জন্য ফ্যারাওদের নির্ভর করতে হ'ত উচ্চপদস্থ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের উপর। এই সব রাজতুল্য শাসকরাই সবরকম কর সংগ্রহ করতেন। পুরোহিত ও করণিক জাতীয় লোকেরা এঁদের সাহায্য করতেন।

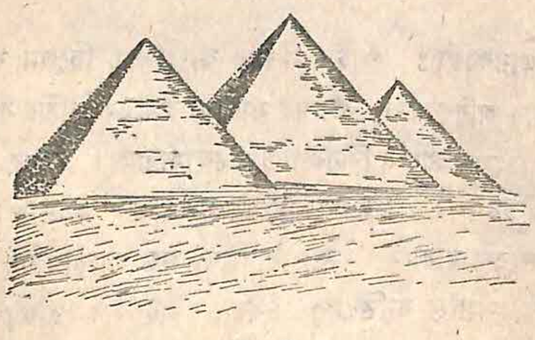
সৈনিক ও শ্রমজীবী ঃ সৈনিকরা হচ্ছে যুদ্ধ ব্যবসায়ী। তারা

দেশরক্ষা ও রাজ্যবিস্তারে নিযুক্ত থাকত। সৈন্যবাহিনী অভিজাতদের এবং সমাজের সম্ভ্রান্তদের দেহরক্ষী হিসাবেও কাজ করত। তারা এদের সম্পত্তি রক্ষার জন্যও নিযুক্ত থাকত।

প্রাচীন মিশরে শ্রমজীবীদের দুই ভাগে ভাগ করা যায়। স্বাধীন শ্রমিক যারা দলবেঁধে কাজ করত আর ছিল যুদ্ধবন্দী বা অন্য কারণে শাস্তি পেয়ে যারা ক্রীতদাস হয়েছে। এদের মধ্যে কামার, কুমোর, ছুতোর, স্বর্ণকার, তাঁতী, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি অনেকেই ছিল। বাঁধ বাঁধা, খালকাটা ও সংস্কার করা, রাস্তা তৈরী করা, মন্দির, পিরামিড তৈরী করাও এই শ্রমজীবীদের কাজ।

ব্যবসা ঃ প্রাচীন মিশরে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হয়েছিল। অতি প্রাচীন কাল থেকেই মিশরীয়রা ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য খ্যাত। তাদের জাহাজ ক্রীট্ কাইপ্রাস দ্বীপে যাতায়াত করত। লোহিত সাগর আর আফ্রিকার পূর্ব উপকূলেও বাণিজ্য পোতগুলির যাতায়াত ছিল। এই পথ দিয়েই ভারতের জিনিস মিশরে পৌঁছাত। মিশরীয়রা বিদেশ থেকে নানারকম বিলাস দ্রব্য, তেল, রূপো ও সেগুণ কাঠ আমদানী করত। স্থল-পথে বাণিজ্য চলত নিউবিয়া ও সুদানের সঙ্গে, সে অঞ্চল থেকে আসত হাতীর দাঁত ও নানা বনজ পদার্থ।

পিরামিড ঃ মৃত্যুর পরেও জীবন আছে মিশরীয়রা বিশ্বাস করত। তাই মৃতদেহকে তারা ওষুধ দিয়ে কবরের মধ্যে রক্ষা করত। আর সেই



পিরামিড

কবরের উপরে বিশাল বিশাল পাথর দিয়ে সমাধি সৌধ বা পিরামিড তৈরী করত। এই রকম সমাধি মন্দিরকে বলা হয় পিরামিড। পিরামিডের

মধ্যেই রেখে দেওয়া হ'ত মৃতব্যক্তির দরকারী ও পছন্দসই জিনিসপত্র আর নানা রকম পোষাক-পরিচ্ছদ, গহনা আসবাব, খাদ্য ও পানীয়। প্রথম পিরামিড হয় রাজা জোসেরের সময় অর্থাৎ খ্রীষ্ট জন্মের তিন হাজার বছর আগে।

রাজা, রাণী ও রাজপুরুষদের পিরামিডগুলি হ'ত বড় রকমের। এই পিরামিডগুলি স্থাপত্য শিল্পের এক :অতুলনীয় নিদর্শন। নীলনদের অদূরে প্রায় ৪০টি পিরামিড এখনো দেখা যায় তার মধ্যে তিনটিই চোখে পড়বার মত তাদের বিশাল আকারের জন্য। সবচেয়ে উঁচু পিরামিডটি ফ্যারাও খুফু মরবার আগে তৈরী করেছিলেন। খ্রীষ্ট-জন্মের আড়াই হাজার বছর আগে এই পিরামিড তৈরী হয়েছিল। এই পিরামিডে প্রায় ২০ লক্ষ পাথর লেগেছিল। এক একটি পাথরের ওজন ছিল ৫০ মণ। এই স্তূপের নীচে প্রবেশের মুখে গোপন সুড়ঙ্গ আছে। আর তার শেষ প্রান্তে আছে রাজার মমি।

ধর্মবিশ্বাস ঃ প্রাচীন মিশরবাসীরা বিশ্বাস করত যে প্রত্যেক প্রাকৃতিক শক্তির পিছনেই আছে কোন না কোন দেবীর শক্তি, এদের মধ্যে জল আর আলোক অর্থাৎ নীলনদ আর সূর্যকে তারা সবচেয়ে বড় দেবতা বলে মনে করত। কাল্পনিক দেবদেবী ছাড়াও বহু জীবজন্তুকে তারা দেবতাজ্ঞানে পূজা করত, এই সব প্রাণীর মধ্যে বৃষ ছিল প্রধান। এছাড়া বিড়াল, বাজপাখী, কুমীর ইত্যাদিও আছে।



মিশরীয় দেব-দেবীর মূর্তি

মমি ঃ মিশরবাসীরা আরও বিশ্বাস করত যে মৃত্যুর পরেও মানুষের সুখদুঃখ শেষ হয় না। সেইজন্য তারা মৃতদেহকে নানারকম ওষুধ দিয়ে ভিজিয়ে শক্ত করে রেখে দিত, পরে কাপড়ে মুড়ে কাঠের বাক্সের মধ্যে রাখা হ'ত। এই রকম সংরক্ষিত শবদেহগুলিকে বলা হয় মমি।

উপজীবিকা ঃ মিশরবাসীদের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষিকাজ। নানারকম শিল্পে বহুলোক নিযুক্ত থাকত। মৃৎশিল্প, পাথর খোদাই, কাপড় বোনা ও নানান ধরণের ধাতু শিল্পেরও প্রসার হয়। আর অনেক লোক

এই সব শিল্পকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত। হাতীর দাঁত ও অন্যান্য ধাতু দিয়ে গহনা তৈরী করত অনেক লোক। পশুপালন ও ব্যবসাবাণিজ্যও বহুলোকের উপজীবিকা ছিল।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

(ক) মিশরের সভ্যতা কোন নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল ?

(খ) ফ্যারাও কাদের বলা হয় ?

(গ) হাইরোগ্লিফিক লিপি কাকে বলে ? এই লিপির আবিষ্কারক কারা ?

(ঘ) পিরামিড কি ? মিশরের বিখ্যাত পিরামিডটি কে তৈরী করেছিলেন ?

(ঙ) মমি বলতে কি বোঝ ?

(চ) মিশরীয়দের প্রধান উপজীবিকা কি ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ধরনের প্রশ্ন ঃ

১। মিশরকে নীলনদের দান বলে কেন ?

২। প্রাচীন মিশরে ফ্যারাওদের সামাজিক মর্যাদা কেমন ছিল ?

৩। প্রাচীন মিশরের পুরোহিতদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৪। প্রাচীন মিশরের লিপি ও লেখকদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৫। প্রাচীন মিশরের কর আদায়কারীদের কাজ কি ছিল ?

৬। মিশরের সৈনিকদের সম্বন্ধে কি জান ?

৭। প্রাচীন মিশরীয়দের জাহাজ কোন কোন দেশে চলাচল করত ?

৮। প্রাচীন মিশরের ব্যবসা-বাণিজ্য কেমন করে চলত?

৯। পিরামিড কি ? কেন পিরামিড তৈরী করা হত ? সবচেয়ে উঁচু পিরামিডটি কে তৈরী করেছিলেন ?

১০। মমি কি ? মমি সম্বন্ধে যা জান লেখ।

১১। প্রাচীন মিশরীয়দের ধর্মবিশ্বাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

১২। মিশরীয়দের প্রধান উপজীবিকা কি ছিল ?

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। মিরশ দেশ কোথায় ? মিশরকে প্রাচ্য জগতের শস্যের গোলা বলা হত কেন ?

২। প্রাচীম মিশরের মানুষের প্রধান প্রধান বৃত্তি আলোচনা কর।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। মিশরের প্রাচীন লিপিকে কি বলে? ডান দিকে ✓ চিহ্ন দিয়ে সঠিক উত্তরটি দেখাও :
কিউনিফর্ম ☐ হাইরোগ্লিফিক ☐ ব্রাহ্মী ☐

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :
(ক) — কে মিশরের দান বলা হয়।
(খ) মিশরের রাজারা মিশরীয় ভাষায় — নামে পরিচিত।
(গ) প্রাচীন মিশরীয় লিখন পদ্ধতিকে বলা হয় —।
(ঘ) মিশরের সমাধি মন্দিরকে বলা হয় —।
(ঙ) প্রাচীন মিশরে সংরক্ষিত শব দেহগুলিকে বলা হয় —।

সিন্ধুসভ্যতা

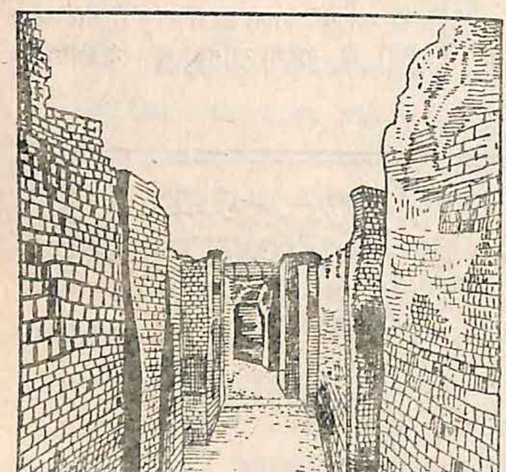
[● সিন্ধুসভ্যতার আবিষ্কার ও অবস্থিতি ● নগরপরিকল্পনা ● খাদ্য ও নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র ● পোশাক পরিচ্ছদ ● শিল্পকলা ● ব্যবসা-বাণিজ্য ● ধর্মবিশ্বাস ● সামাজিক শ্রেণীবিভাগ।]



নীলনদের তীরে মিশরীয় আর ইউফ্রেটিস ও তাইগ্রীস নদীর অববাহিকায়।

স্থমেরীয় সভ্যতার মত খ্রীষ্টজন্মের আড়াই তিন হাজার বছর আগে ভারতের সিন্ধুনদের তীরেও আর একটা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। যার নাম দেওয়া হয়েছে সিন্ধুসভ্যতা। নামকরা ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। সিন্ধুর লারকানা জিলায় আর পাঞ্জাবের হরপ্পায় প্রথমে এর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। সিমলা পাহাড়ের রূপার থেকে আরবসাগরের স্থক্তাগেনদোর আর দক্ষিণে গুজরাটের লোথাল পর্যন্ত প্রাচীন যুগের এই সভ্যতার নমুনা দেখা যায়।

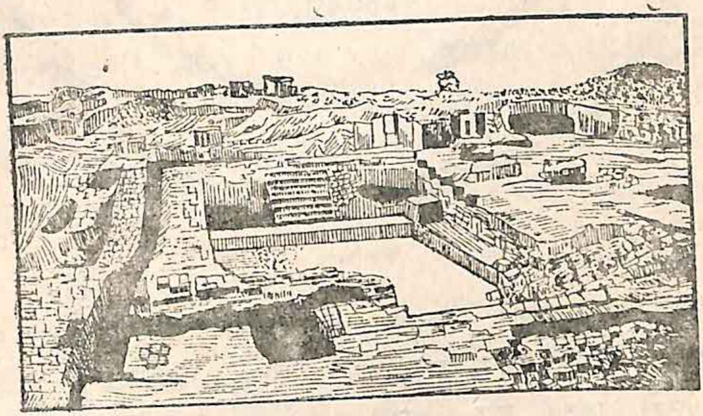
লারকানায় আবিষ্কৃত একটি স্তূপ মহোঞ্জোদারো বা মৃতের স্তূপ নামে পরিচিত এবং সেইজন্য অনেক সময় এই সভ্যতাকে মহোঞ্জোদারো সভ্যতাও বলা হয়। এইখানে যে সব 'সীলমোহর' পাওয়া গেছে তা আজও ভাল করে পড়া যায় নি। সেইজন্য তাদের সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় নি। মহেঞ্জোদারোতে পর পর সাতটি শহর নির্মিত হয়েছিল।


রাজপথ

নগর-পরিকল্পনা ঃ সিন্ধু-সভ্যতার অধিবাসীরা নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত ছিল। মাটি খুঁড়ে যে সমস্ত শহর আবিষ্কার করা হয়েছে তাতে দেখা গেছে শহরে দু-কামরা-ওলা ছোট বাড়ী থেকে আরম্ভ করে প্রাসাদের মত বড় বড় বাড়ীও আছে। প্রতি বছর সিন্ধু নদীর জল বেড়ে বন্যার ফলে ঘরবাড়ী ডুবে যাওয়াতে লোকে ধ্বসে-পড়া ভাঙ্গা ঘরবাড়ীর উপর উঁচু করে নতুন ঘরদোর

বানিয়েছে। এই সব ঘরবাড়ীর পরিকল্পনা আর গঠন-প্রণালী অনেকটা আজকের দিনের মত উন্নত ধরনের। মহেঞ্জোদারোর মধ্যে বড় বড় রাস্তার ধারে বড়লোকদের বড় বড় ইরামত, মধ্যবিত্তদের ছোট ছোট বাড়ী সারি-সারি সাজান। দোতলা, তিনতলা বাড়ীতে এই যুগের অনেক লোক বাস করতেন। রাস্তাগুলো ৯ ফুট থেকে ৩৪ ফুট চওড়া।

পথের দুধারে বাঁধানো নালা দিয়ে ময়লা জল বের হয়। নালাগুলি পাথর দিয়ে ঢাকা। একটি বিরাট স্নানাগারের সন্ধান পাওয়া গেছে যা ১০০ ফুট লম্বা আর চওড়া ১০৮ ফুট। এর মাঝখানের স্নানের জায়গাটা



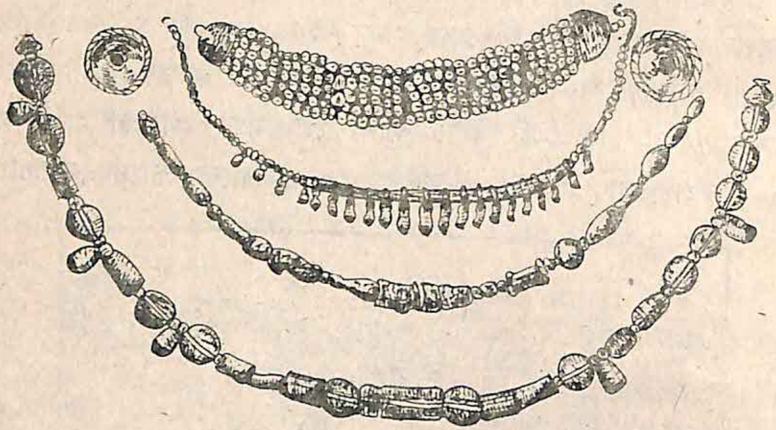
স্নানাগার

লম্বায় ৩৯ ফুট, চওড়ায় ২৩ ফুট আর গভীরতায় ৮ ফুট। চারদিকে ছোট ছোট ঘর। এ ছাড়াও মহেঞ্জোদারোতে কয়েকটা খুব বড় বড় ঘর দেখা যায়। বোধ হয় সেগুলো কারখানা বা মাল বোঝাই রাখার গুদাম-ঘর'। প্রত্যেক বাড়ীতেই বাঁধানো ইঁদারা, বাড়ীগুলো ইটের তৈরী।

খাদ্য ও নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র ঃ খাদ্য ঃ সিন্ধু-সভ্যতার লোকেরা কৃষিজাত দ্রব্য যব, গম প্রভৃতি উৎপাদন করত। তাদের প্রধান খাদ্য ছিল যব, আর গমজাতীয় শস্য আর তার সঙ্গে খেজুর আর কলা। মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি আমিষ জাতীয় খাদ্যও তাদের প্রিয় ছিল। অনুমান করা হয় কোন কোন অঞ্চলে ধানচাষও হ'ত।

পোষাক পরিচ্ছদ ঃ কার্পাস, সূতী ও পশমের ব্যবহার এই যুগের

লোকেরা শিখেছিল। এরা কাপড় বুনতে জানত। মেয়েরা বাড়ীতে তুলো থেকে সুতো তৈরী করত। মেয়েরা ছোট কাপড় পরত। ছেলেরা খুব লম্বা কাপড় জড়িয়ে জড়িয়ে পরে থাকত। মেয়েরা চিরুনি দিয়ে নানা-



অলংকার

রকম চুলবিন্যাস করত। ছেলেরা এবং মেয়েরা উভয়েই গয়না পরতে ভালবাসত। সোনা, রূপা, আর হাতির দাঁত দিয়ে এরা নানারকম গহনা তৈরী করত। হার, আংটি, বালা ইত্যাদি ছেলেমেয়ে দুজনেই পরত। আর মেয়েরা এছাড়াও বিছে, নূপুর, নাকচাবি ইত্যাদি ব্যবহার করত।

নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র ঃ পোড়ামাটির বাসন এই যুগের লোকেরা ব্যবহার করত। তামা, ব্রোঞ্জ আর রূপোর জিনিসেরও অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে। তামা আর ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরী ক্ষুর, চিরুনি, ছুঁচ, ওজন করবার জন্য পাথরের টুকরা, ছোটদের খেলনার গরুর গাড়ী প্রভৃতি বহু জিনিস মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে। খেলনার গরুর গাড়ী দেখে মনে হয় সাধারণ মানুষ গরুতে টানা একজাতীয় গাড়ী যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করত। মেয়েদের খেলনার পুতুল, ছোটদের খেলবার পাথরের গুলীরও ব্যবহার সেই যুগে ছিল। পাশা খেলবার সরঞ্জামও খনন কার্যের ফলে পাওয়া গেছে।

শিল্পকলা ঃ সিন্ধুসভ্যতার সময়ে প্রায় ৫০০ 'সীলমোহর' পাওয়া গেছে। কিন্তু এদের উপর কি কি লেখা আছে তা সব পড়া যায়নি বলে আমরা সিন্ধুবাসীদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারি নি। সীলমোহরের উপর খোদাই করা নানা পশুমূর্তি আর হরপ্পায় পাওয়া পাথরের মূর্তির গঠননৈপুণ্য থেকে আমরা ঐ যুগের শিল্পকলার উন্নতি সম্বন্ধে জানতে পারি। কুমোরের চাকা আর পোড়া ইটের ব্যবহার এই যুগের কারিগরী



সীলমোহর

বিদ্যার নৈপুণ্য প্রমাণ করে। বহুদূর থেকে কাঁচামাল আসত শিল্পীদের জন্য। হিমালয় থেকে দেবদারু কাঠ জলে ভাসিয়ে নিয়ে আসা হ'ত কাঠের উপর শিল্পকাজের জন্য। কুমোরের কাজ ছিল সবচেয়ে দেখার মত। লালমাটির উপর কালো রং দিয়ে তারা নানারকম কারুকাজ করত, গাছ-



মাটির পাত্র

পাতা পশুপক্ষীর ছবি আঁকত। তাঁতী, রাজমিস্ত্রী, স্বর্ণকার প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগররা তাদের কাজের দক্ষতা নানা শিল্পকাজের মধ্যে দেখিয়েছেন।

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ স্থল ও নৌবাণিজ্যে সিন্ধুবাসীরা সমান পটু ছিল ভারতে এবং ভারতের বাইরে এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া সিন্ধুসভ্যতার সীলমোহর থেকে এই যুগের বাণিজ্যের প্রসার প্রমাণিত হয়। স্থলপথে পারস্য ও জলপথে সুদূর মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত তারা পাড়ি দিত বলে জানা যায়। মেসোপটেমিয়ার কয়েকটি সীলমোহর

সিন্ধু-উপত্যকায় পাওয়া গেছে আবার মেসোপটেমিয়ায় পাওয়া গেছে সিন্ধু উপত্যকার সীলমোহর। এর থেকে অনুমান করা হয় যে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগসূত্র ছিল। লোথাল শহরে একটা বন্দর আবিষ্কৃত হয়েছে। মনে করা হয় এই বন্দর থেকেই আমদানি-রপ্তানি হ'ত। মাপ এবং ওজন সম্বন্ধে এদের বেশ জ্ঞান ছিল কারণ যে সব ওজন করবার জিনিস পাওয়া গেছে আকার এবং মাপের দিক থেকে বেশ নিখুঁত ধরনের।

ধর্মবিশ্বাস ঃ সমস্ত প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মত সিন্ধু-সভ্যতাতেও মাতৃপূজার প্রচলন ছিল। এ ছাড়া একটি সীলমোহরে যোগাসনে বসা মূর্তিকে শিবের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই মূর্তির তিনটে মুখ এবং চারিদিক পশু পরিবেষ্টিত। এই মূর্তিকেই পশুপতি শিব বলা হয়! পশুপক্ষীর আরাধনাও এরা করত। কিছু কিছু গাছকেও এরা দেবতা মনে করত। পিপল গাছ তার মধ্যে অন্যতম।


শিবমূর্তি

সামাজিক শ্রেণীবিভাগ ঃ খননকার্যের ফলে সিন্ধু-সভ্যতা যে সুপরিকল্পিত নগর ছিল তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে। সেই সময়কার অধিবাসীরা যে নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত ছিল সেটা বোঝা যায়। রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী সবই বেশ সাজান গোছান ছিল। ধনীদের জন্য বড় বড় প্রাসাদ, অট্টালিকা ছিল। বণিক বা উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীরাও বড় বাড়ীতে বাস করতেন, শ্রমিক অর্থাৎ তাঁতী, কুমোর, রাজমিস্ত্রী, স্বর্ণকার এদের বাড়ীগুলো ছোট ছোট কামরাবিশিষ্ট ছিল। বড় বড় বাড়ীগুলোতে জানলা, দরজা, কুয়া, পয়ঃপ্রণালী সবই থাকত। নগরের স্বাস্থ্য পরিদর্শনের ব্যবস্থা ছিল। লেখকশ্রেণী করণিকের কাজ, সংখ্যা গণনা, ওজনের মাপ ঠিক করা ইত্যাদি কাজে লিপ্ত থাকতেন। নাগরিক জীবন থেকে অনুমিত হয় যে মানুষ গ্রামের কৃষকদের উপর নির্ভরশীল ছিল। সিন্ধুবাসীরা

আমিষ জাতীয় খাদ্য অর্থাৎ মাছ মাংস ডিম খেতেন। সেই জন্য মৎস্যজীবা শ্রেণীর উৎপত্তি হয়। এরা সমুদ্র-উপকূলে বাস করতেন। বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার আর নানা রকম শিল্পকলার বিকাশের ফলে ব্যবসায়ী ও শিল্পীশ্রেণীর উদ্ভব হয়। এদের প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাজে লিপ্ত থেকে দক্ষতা অর্জন করেন। ফলে সিন্ধুসভ্যতার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় হয়েছিল।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

(ক) সিন্ধুনদের তীরে কোন সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল ?

(খ) সিন্ধুসভ্যতার আবিষ্কারক কে ?

(গ) সিন্ধুসভ্যতা কি ধরনের সভ্যতা ?

(ঘ) সিন্ধুবাসীদের প্রধান খাদ্য কি ছিল ?

(ঙ) সিন্ধুবাসীরা কি ধরনের পোশাক পরত ?

(চ) সিন্ধুউপত্যকার অধিবাসীরা কোন কোন অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্য করত ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ধরনের প্রশ্ন ঃ

১। ভারতবর্ষের কোন অঞ্চলে সিন্ধুসভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল ? এই সভ্যতার নাম সিন্ধুসভ্যতা হল কেন ?

২। সিন্ধু-সভ্যতার নগর পরিকল্পনা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩। সিন্ধু-সভ্যতার অধিবাসীদের খাদ্য ও বিভিন্ন ব্যবহার্য দ্রব্যের বিবরণ দাও।

৪। সিন্ধু-সভ্যতার পোশাক-পরিচ্ছদ, গয়না ও অস্ত্রশস্ত্র কেমন ছিল ?

৫। সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসীদের বৃত্তি ও বিভিন্ন শিল্পের কারিগরদের কথা আলোচনা কর।

৬। সিন্ধুবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৭। সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের পূজা উপাসনা কি ছিল ?

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। মহেঞ্জোদারো সভ্যতা কে আবিষ্কার করেছিলেন ? এই সভ্যতার নাম সিন্ধুসভ্যতা দেওয়া হয়েছে কেন ? মহেঞ্জোদারোয় পাওয়া স্নানাগারটি সম্বন্ধে যাহা জান লেখ।

২। সিন্ধুসভ্যতায় কত সীলমোহর পাওয়া গেছে? এর দ্বারা সিন্ধু-সভ্যতা সম্বন্ধে কি জানা যায়?

৩। সিন্ধু-সভ্যতায় সামাজিক শ্রেণীবিভাগ কি ভাবে গড়ে উঠেছিল?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরটিতে √ দাগ দাও ঃ

(ক) সিন্ধু-সভ্যতা আবিষ্কার করেছেন

মেগাস্থিনিস ▭ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ▭ হেরোডোটাস ▭

(খ) সিন্ধু-সভ্যতায় কোন ধাতুর ব্যবহার দেখা যায়নি—লোহা ▭ রূপা ▭ তামা ▭ ।

চীন

[● হোয়াং হো ও ইয়াং সিকিয়াং উপত্যকা ● পৌরাণিক যুগে চীন-বন্যা সম্পর্কে কাহিনী।]

পৃথিবীর সুপ্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে চীন অন্যতম। চীনের দক্ষিণ পশ্চিমে হিমালয়, উত্তরে গোবি মরুভূমি ও সাইবেরিয়া, পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর আর পশ্চিমের সীমানায় রুশ-ভারত সীমান্ত। চীনের আদি সভ্যতা ইয়াং সিকিয়াং ও হোয়াং হো (পীত) নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল। তিন হাজার মাইল দীর্ঘ ইয়াং সিকিয়াং ও তার উত্তরে পীত নদীর পলিমাটি, চীনের আদি সভ্যতার জন্মভূমি। প্রাচীনকালে এই দুটি নদীর কূলে কূলে ঘন জংগল সাফ করে, নদীতে বাঁধ দিয়ে ও জমি চাষ করে সভ্যমানুষ জনবসতি গড়েছে। এরা কারা এবং কোথা থেকে এসেছিল তা সঠিক বলা যায় না।

চীনের সভ্যতা প্রাচীন কিন্তু কত প্রাচীন তা' বলা কঠিন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে খ্রীষ্ট জন্মের বিশ হাজার বছরেরও আগে মংগোলিয়াতে নতুন পাথরের যুগের সভ্যতার নমুনা পাওয়া গেছে। নতুন পাথরের যুগের আগে পুরাতন পাথরের যুগের মানুষকে পিকিংম্যান বলা হয়। এরা আগুনের ব্যবহার জানত। এদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল রুক্ষ পাথরের টুকরো। এরা ফলমূল সংগ্রহ করত আর শিকার করত। নতুন পাথরের যুগে মানুষ পশুপালন ও চাষ আবাদ শিখল। এই যুগের হাতিয়ার ছিল মসৃণ আর

চক্চকে পাথরের তৈয়ারী। এর পরে চীনের মানুষ তামার আর ব্রোঞ্জের ব্যবহার শেখে। চীনের সভ্যতার সঙ্গে মিশর আর মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার অনেক মিল পাওয়া যায়।

চীনকে ঐতিহাসিকদের স্বর্গ বলা হয়। চীনারা প্রাচীনকাল থেকে তাদের দেশের খুঁটিনাটি লিখে রেখেছে। চীনের কিংবদন্তী অনুসারে আদিমানব ফান-কু ২১ লক্ষ ৩১ হাজার বছর আগে পৃথিবীকে স্ববশে এনেছিলেন। চীনের আরেকটি প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে প্রায় চার হাজার বছর আগে পীত নদী অঞ্চলে হুয়াংতি নামে একজন প্রসিদ্ধ শাসক ছিলেন। তাঁর সময়ে লোকে নৌকা চালাতে, লিখতে, গরুর গাড়ীর চাকা বানাতে শেখে। চীনে মিশরীয়দের মত ছবি এঁকে সব শব্দ বোঝান হ'ত। চীনে প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদা চিহ্ন দিয়ে আঁকা হয়ে আসছে। হুয়াংতির পর ইয়াও, সুন এবং ইউ নামে তিনজন শাসকের কথা শোনা যায়। এরা নিজগুণে একের পর এক সিংহাসন লাভ করেন। ইয়াওর সময় পীত নদীর বন্যায় দেশ ভেসে যায়। তিনি রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের নিয়ে এক সভা ডাকেন। ইউর পিতা কুনকে বন্যার জল নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়া হয়। কুন ব্যর্থ হয়েছিলেন বলে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। পরে তাঁর পুত্র ইউ প্রায় ১৩ বছরের চেষ্টায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন। এরপর তিনি দেশের শাসক নির্বাচিত হয়েছিলেন। তার পুত্র চি-র সময় থেকে দেশের শাসক নির্বাচন করার প্রথা বিলুপ্ত হয়। চি-র পরবর্তী রাজারা শিয়া বংশীয় রাজা নামে পরিচিত।

এই সব প্রবাদের মূলে কতখানি সত্য ঘটনা আছে তা যাচাই করার জন্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

(ক) চীন সভ্যতা কোন নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল।

(খ) চীনের আদি মানবকে কি বলা হয় ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন :

[এক] চীনের প্রাচীন সভ্যতা কোথায় ও কিভাবে গড়ে উঠেছিল ?

[দুই] চীনকে ঐতিহাসিকের স্বর্গ বলা হয় কেন ?

[তিন] হুয়াংতির সময় দেশের কি কি উন্নতি হয়েছিল ?

[চার] ইয়াও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন ? বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে কত সময় লেগেছিল ?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরটিতে √ দাগ দাও :

চীনদেশের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল—

নীলনদ ▭ টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস ▭ হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং ▭

▭ নদীতীরে।

নদীমাতৃক সভ্যতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য

পৃথিবীর যেসব প্রাচীন সভ্যতাগুলি সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি, সেইসব সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছিল নদীর পলিমাটি দিয়ে গড়া উপত্যকায়। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গড়ে ওঠে লোকালয়, নগর আর রাষ্ট্র। তারপরে এই রাষ্ট্রগুলির সামাজিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছিল।

মানব-সভ্যতার অগ্রগতি নির্ভর করে ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের উপর। মেসোপোটেমিয়া, মিশর, ভারত ও চীনের প্রাচীন সভ্যতা অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশে গড়ে উঠেছিল। এই সব দেশে চাষের জমি নদীর পলিমাটিতে উর্বর। নদীপথে অন্যান্য সভ্যতার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন সহজ হয়েছিল ফলে বাণিজ্যের প্রসার হয়েছিল। এইসব সভ্যতার অগ্রগতির মূলে নিশ্চিত জীবন-যাপনের অনুকূল পরিবেশ। তাই অতি সহজে মেসোপোটেমিয়া, মিশর, ভারত ও চীনের মানুষ প্রস্তর যুগ পেরিয়ে তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগে পৌঁছেছে। নদীমাতৃক দেশের জলবায়ু তাদের অগ্রগতিকে সুগম করেছে।

যাযাবর মানুষের পক্ষে কোন এক স্থানের সভ্যতার বুনিয়াদ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। অনুকূল পরিবেশে নদীর কূলে কূলে মানুষ কৃষিকার্য শুরু করে। এইসব স্থানে সে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে, ফলে গ্রাম আর

নগরের পত্তন হয়। নদীতীরবর্তী অঞ্চলগুলি প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত হয়। কৃষিকার্য মানুষের খাদ্য সমস্যার সুরাহা করেছিল। এর-ফলে মানব সভ্যতার সৃজনীশক্তি বৃদ্ধি পেল। আবার এই সময়ে শহর ও নগরের লোকদের মধ্যে জন্মাল নাগরিক চেতনা। ফলে এই যুগে সভ্যতার জয়যাত্রা সহজ ও সুগম হয়েছিল। নদীর কূলেকূলে প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে অল্প বিস্তর প্রায় সর্বত্রই এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

ঐ সময়ের সবক'টি সভ্যতাতেই কৃষিকাজ ছিল মানুষের প্রধান উপজীবিকা। তাছাড়া এ যুগের মানুষ পশুপালন, নানা ধরনের শিল্পকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। এক এলাকার মানুষের সঙ্গে আর এক এলাকার মানুষের—যেমন সিন্ধুবাসীদের সঙ্গে মেসোপোটেমিয়ার লোকেদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত, এমন প্রমাণও পাওয়া গেছে। ধান, গম, যব, ভুট্টা, খেজুর ইত্যাদি ছিল এদের প্রধান খাদ্য। তাছাড়া এদের প্রিয় খাদ্যের মধ্যে ছিল মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ও মধু। সিন্ধুবাসীদের ও মেসোপোটেমিয়ার অধিবাসীদের শিল্পকর্ম ও কারিগরী বিদ্যা প্রায় একই-রকম ছিল। উভয় দেশেই কুমোরের চাক, বর্শার ফলা ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। তবে কারিগরী কাজের মধ্যে কিছুটা তফাৎ ছিল।

এই যুগে সূতী, রেশম ও পশম বস্ত্রে প্রচলন ছিল। মেয়েরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সোনা, রূপো, তামা ব্রোঞ্জ আর হাতির দাঁতের গহনা পরত। সমাজে বিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল। পূর্বপুরুষদের জীবিকা বংশপরম্পরায় গ্রহণ করা হ'ত। এইভাবে জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল।

দেশের সকল ক্ষমতা এক শ্রেণীর লোকের হাতে ছিল। ফ্যারাওরা নিজেদের ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে মনে করতেন। সাধারণতঃ জ্যোতিষশাস্ত্র যাদুবিদ্যা, ইন্দ্রজাল ও বহু দেবদেবীতে লোকের বিশ্বাস ছিল। এই সম্পর্কে অনেক প্রমাণ এই সব সভ্যতাগুলির খনন কার্যের ফলে আমরা পেয়েছি। হিন্দুদের মতে বরুণ দেবতা হচ্ছেন সাগরের রাজা। আবার ব্যাবিলনীয়রা মনে করেন ইয়া দেবতা সাগরের মাঝে মাছের দেশে বাস করেন। গাছপালা জীবজন্তু, পাথরকে পর্যন্ত এরা দেবতারূপে পূজো করত। সমাজে পুরোহিতরা

সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। মিশরের পুরোহিতরা সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। সমাজে দাস প্রথার প্রচলন ছিল।

মিশরে অর্থনৈতিক ক্ষমতা অনেক বেশী কেন্দ্রীভূত ছিল। ফ্যারাও আর তার বংশধরেরাই প্রায় সমস্ত ক্ষমতা পরিচালনা করতেন। ভারতবর্ষেও হরপ্পায় খনন কার্যের ফলে দেখা গেছে বিত্তবানরা অথবা মুষ্টিমেয় পুরোহিত শ্রেণীর লোকেরা বা দেবদত্ত ক্ষমতায় বিশ্বাসী রাজবংশীয়রা নগরের কেন্দ্রস্থলে ভাল ভাল বাড়ীতে বাস করতেন। শ্রমিকদের বাড়ীগুলো ছিল গলির মধ্যে আর আকারে ছোট। এর থেকে বোঝা যায় যে ধনী দরিদ্র ভেদ ছিল এবং সমাজে শ্রেণী বিভাগ ছিল। সুমের এবং মিশরের মতো সিন্ধুসভ্যতারও নিজস্ব লিপি ছিল। আজও সিন্ধুসভ্যতার লিপির পাঠোদ্ধার করা যায় নি।

অর্থনৈতিক অবস্থা: বিভিন্ন নদী উপত্যকায় সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই সভ্যতার মানুষদের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হয়। কৃষিকাজ ছিল এদের প্রধান উপজীবিকা। নানা ধরনের শিল্পকলার দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পীরা তাদের জীবিকা নির্বাহ করত। উদ্বৃত্ত ফসল ও শিল্পসামগ্রী বিদেশে চালান দেওয়া হ'ত। আবার বিদেশ থেকে আমদানি করা হ'ত দরকারী জিনিসপত্র। এইভাবে গড়ে উঠেছিল বৈদেশিক বাণিজ্য। দেশ-বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেন-দেন করে তারা আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। শিল্পী ও কারিগররা নগরে বাস করত। কৃষিজীবীরা সাধারণত থাকত গ্রামে। নগরের জীবনযাত্রা ছিল পরিচ্ছন্ন। শহরের লোকেরা গ্রামের লোকেদের উপর নির্ভরশীল ছিল। পোড়া ইটের বড় বড় বাড়ী, মন্দির, পাকা রাস্তা, পরিচ্ছন্ন নগর পরিকল্পনা, বন্যা নিরোধের ব্যবস্থা প্রভৃতি থেকে এই যুগের মানুষের সমৃদ্ধির কথা জানা যায়।

অনুশীলনী

১। নদী-উপত্যকার সভ্যতাগুলির সমাজব্যবস্থা কিরূপ ছিল?

২। নদী-উপত্যকার সভ্যতাগুলির মধ্যে কি কি মিল দেখতে পাওয়া যায়?

৩। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে কোথায় কোথায় নদী-তীরের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল? এই সভ্যতার কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

৪। নদী উপত্যকার সভ্যতাগুলির অর্থনৈতিক অবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৫

লৌহ যুগ

লৌহের আবিষ্কার, ব্যবহার ও তার ফলাফল : অনেকের মতে খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় ১৫০০ বছর আগে আর্যরা লোহার ব্যবহার শিখেছিল। আর্যরা প্রায় একই সঙ্গে লোহা আর অশ্বের ব্যবহার শেখে। ফলে যুদ্ধ বিগ্রহে তারা হয়ে ওঠে প্রায় অপরাজেয়। খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় ১২০০ বছর আগে লোহার ব্যবহার দ্রুত প্রসার লাভ করে। মিশরে খ্রীষ্টপূর্ব ৬৫০ বছর আগে লোহার ব্যবহার জনপ্রিয় হয়। ভারত ও চীনে কখন লোহার ব্যবহার আরম্ভ হয় তা সঠিকভাবে জানা যায় না।

ফলাফল : লৌহ যুগের মানব সভ্যতা পূর্ববর্তী ব্রোঞ্জযুগের থেকে অনেক কিছু শিখেছিল। গ্রীকরা ঈজিয়ানদের থেকে বিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা ও শিল্প শিক্ষা নিয়েছিল। লৌহ যুগে যেসব সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে পারসিক সাম্রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত ছিল। এর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হয়। ফোনেশিয় ও গ্রাকরা উত্তরে আফ্রিকা, এশিয়া মাইনর পর্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন করে। আর্যরা ভারতে বৈদিক সভ্যতা গড়ে তোলে। লৌহ যুগে মিশরীয় চিত্রলিপি ও সুমেরীয় কোণাক্ষর থেকে বর্ণ লিপির উদ্ভব হয়। মুদ্রার ব্যবহারের ফলে শিল্পের বিস্তার হয়। আগে পণ্যের বিনিময় হ'ত বার্টার মারফতে। খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টক শতকে অস্থূরীয় রাজারা নির্দিষ্ট ওজনের রূপোর বাটে নামাংকিত করতে থাকেন। এইগুলির ব্যবহারের ফলে পণ্য বিনিময় সহজ হয়েছিল। সুদে ধার দেওয়া প্রথা আর মহাজনী কারবারও চালু ছিল।

সমাজ : খ্রীষ্টপূর্ব দুই হাজার বছর থেকে সমাজে যে পুরানো কাঠামো চলে আসছিল লোহার ব্যবহার শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে তা ভেঙ্গে পড়তে লাগল। যাযাবর জাতিরা লোহার তৈরী ঢাল, তলোয়ার বর্শার জোরে প্রাচীন সভ্যতাগুলির প্রাণকেন্দ্র দখল করেছিল। এদের নেতারা পুরানো রাজবংশীয়দের সিংহাসনচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করেছিল। চাষে লোহার ব্যবহারে শস্যের ফলন বেড়েছিল। কিন্তু কৃষক শ্রেণীর লোকেরা আগের-মতনই দীনহীন হয়ে রইল। শহরগুলোর আয়তনও এই সময় বৃহত্তর

হয়েছিল এইসব শহরে নানারকমের বিলাসের ব্যবস্থা ছিল। ব্যাবিলনের একজন বণিকের বাসগৃহে ১৮টি মনোরম ঘর ছিল। শহরে মানুষেরা, শিক্ষক শিল্পী, করণিক সকলেই এই প্রাচুর্যের অংশীদার ছিলেন।

অর্থনীতি ঃ এই যুগে গ্রামের গরীবরা চাষ করত আর মাছ ধরত। বড়লোকেরা গ্রামাঞ্চলে খামারের মালিক ছিল। শহরে নানাশিল্পের প্রসার হয়েছিল। বাণিজ্যের প্রয়োজনে দেশে বিদেশে পণ্য দেওয়া নেওয়া চলত। সুদের কারবারে মহাজনেরা লাভবান হ'ত। ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রসারের ফলে বিত্তশালীদের কাছে বিলাসদ্রব্য সহজলভ্য হয়েছিল।

রাজতন্ত্র ঃ লোহার ব্যবহার যখন শুরু হয় তখন থেকে রাজতন্ত্রেও কিছু কিছু নতুনত্ব দেখা দিয়েছিল। এই সময় রাজারা নিজেদের ভগবান প্রেরিত পুরুষ বলে দাবী করেন। অর্থাৎ রাজার কোন হুকুম অমান্য করার মানে ঈশ্বরের আদেশের বিরোধিতা করা। মিশর, ব্যাবিলন, লিডিয়া, অসুররাজ্য সব জায়গাতেই এই দৈবদত্ত রাজতন্ত্রের প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু গ্রীস ও রোম গণতন্ত্রের পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিল। এই গণতন্ত্রে 'দাস' ও বিজিত জাতির লোকেদের কোন অধিকার ছিল না।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

(ক) লোহার ব্যবহার কবে থেকে শুরু এবং প্রথম ব্যবহার কোথায় হয়েছিল ?
(খ) লৌহযুগে যে সব সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কোনটি ?
(গ) দেবদত্ত রাজতন্ত্র কাকে বলে ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ধরনের প্রশ্ন ঃ

১। লৌহযুগ বলিতে কি বোঝ ? লোহার ব্যবহার কবে থেকে শুরু হয় ?
২। লোহার ব্যবহারের ফলে কি কি পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল ?
৩। কোন কোন দেশে লৌহযুগে নতুন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ?

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। লোহার ব্যবহার মানুষের অর্থ নৈতিক জীবনের কি পরিবর্তন এনেছিল ?
২। সমাজ জীবনের উপর লোহার প্রভাব বর্ণনা কর।
৩। লৌহ যুগের সভ্যতার রাজতন্ত্রের আবির্ভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। প্রথম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় ঃ
নতুন প্রস্তর যুগে ▭ লৌহযুগে ▭ তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে ▭।

৬ ব্যাবিলন, মিশর, ইরাণ ও ইহুদীদের ইতিবৃত্ত

[এক] ব্যাবিলনের কথা

[● স্বচনা ● কৃষি ও বাণিজ্য ● মন্দির ও পুরোহিত ● শিক্ষা ও সংস্কৃতি ● হামুরাবির বিধান ● হামুরাবির আইনে সমাজের চিত্র]

সূচনা ঃ ইউফ্রেটিস ও তাইগ্রীস নদীর জলে সিঞ্চিত মেসোপটেমিয়ার ইতিহাস বারবার বদলেছে। স্থমেরীয় সভ্যতার পতনের পর আক্কাদীরা এসে নতুন সভ্যতা গড়েছে। ব্যাবিলনীয় সভ্যতা আক্কাদী ও স্থমেরীয় সভ্যতার সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল। আর এই সভ্যতার জনক ছিল এক নতুন সেমেটিক দল। রাজধানী ব্যাবিলনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বলে এই সভ্যতাকে ব্যাবিলনীয় সভ্যতা বলা হয়।

কৃষি ঃ যে নতুন সেমেটিক জাতির মানুষ ব্যাবিলনীয় সভ্যতার পত্তন করে তারা চাষ ও ক্ষেত মজুরের কাজে দক্ষ ছিল। চাষের জন্য জলের প্রয়োজন। সেইজন্য ব্যাবিলনে ছিল অনেক সেচ খাল। আবার বন্যার জলে ঘর বাড়ী শস্য সব নষ্ট হয়ে যায় সেইজন্য বন্যার জল বাঁধ দিয়ে ও খাল কেটে সরানোর প্রয়োজন। বন্যার পর জমির আল ধুয়ে যেত আর জমির মালিকানা এবং সীমা ঠিক করা কঠিন হ'ত। জমির সীমা আবার যাতে উদ্ধার করা যায় তার জন্য ব্যাবিলনীয়রা জমির মাপজোকের পদ্ধতিতে দক্ষতা অর্জন করেছিল। ব্যাবিলনীয় চাষীরা বছরে তুইবার ভূমি চাষ করত। জলের ভাগ নিয়ে যাতে ঝগড়া না বাধে তার জন্য নানা আইন-কানুন ছিল।

বাণিজ্য ঃ বাণিজ্যলক্ষ্মী ব্যাবিলনীয়দের উপর কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করেছিলেন। এই যুগে দিকে দিকে ব্যাবিলনের বাণিজ্যে প্রসার হয়েছিল। জলপথে বণিকের বাণিজ্যতরী বহন করতে আনত কাঁচ, মূল্যবান পাথর ও ধাতু আর স্থলপথে দূরদূরান্ত থেকে বণিকরা আনত পণ্য। দেশে বিদেশে ব্যাবিলনীয়েরা পণ্য রপ্তানী করত। বাট্টার বদলে এখন নির্দিষ্ট ওজনের স্থপরিচিত বণিক বা মহাজনের নামাংকিত সোনা বা রূপার সীলমোহরের ব্যবহার চালু হয়েছিল। ব্যাবিলনীয়দের বাণিজ্যের প্রসারের মূলে ছিল

নিয়মিত হিসাব রাখার সুশৃংখল পদ্ধতি। তারা উৎপন্ন ফসল যত্ন করে ওজন ও পরিমাপ করত এবং সঞ্চয় করত। সঞ্চয়ের ফলে বাণিজ্যের প্রসার হয়েছিল।

মন্দির এবং পুরোহিতঃ ব্যাবিলনের লোকেরা ধর্মভীরু ছিল। বিশেষত প্রতি বছর বন্যার ধ্বংসলীলা দেখে তারা জলদেবতাকে শান্ত রাখবার জন্য প্রার্থনা করত। প্রতিটি শহরের নিজস্ব দেবমূর্তি ছিল। দেবমন্দিরের সামনে সুউচ্চ চত্বর বা জিগুরাতের শিখা দূর থেকে দেখা যেত। দেবস্থানের ভাণ্ডার লোকের দানে পূর্ণ হ'ত। ব্যাবিলনের দেবতাদের প্রধান ছিলেন মারডুক। দেশের সকল সম্পদের তিনিই মালিক। রাজা মারডুকের প্রতিনিধি মাত্র। অন্যান্য দেবদেবীর মধ্যে প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন ইস্তার।

ব্যাবিলনের পুরোহিত গোষ্ঠী ছিলেন একটি সংঘবদ্ধ শ্রেণী। দেশের কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যে তাদের প্রভাব ছিল খুব বেশী। লোকেব ধর্মভয় আর সংস্কারের সুযোগ তাঁরা গ্রহণ করতেন। জীবজন্তুর নারীভূড়ি দেখে বা গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি থেকে তারা ভবিষ্যতবাণী করতেন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতিঃ দেবালয়ে শিক্ষাদানের জন্য স্থান করে দেওয়া হ'ত। ব্যাবিলনীয়রা প্রাচীন সুমেরীয় কোণাক্ষরকে সহজবোধ্য করার জন্য ৬০০ প্রতীকের প্রবর্তন করেছিল। প্রাচীন ব্যাবিলনে ব্যবহার করা এই লিপি থেকে তাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। এইরকম একটা ব্যাবিলনীয় প্রাচীন লিপি পাঠ করে বিদ্যালয়ের ছাত্রের লেখার উপর শিক্ষকের মন্তব্য পাওয়া গিয়েছে।

ব্যাবিলনে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের ফলে এই যুগে সংখ্যা-গণনায়, জমির মাপজোক করার ক্ষেত্রে ও জিনিসপত্রের ওজন করার পদ্ধতিতে উন্নতি হয়েছিল। মন্দিরের পুরোহিতরা শস্যের ফলন সম্পর্কে সঠিক হিসাব রাখতেন এবং তারা বিদেশে উদ্বৃত্ত পণ্য পাঠাতেন। কারিগর ও শ্রমিকদের জন্য নিয়মিত খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করতেন ও দুর্ভিক্ষের সময় যাতে পীড়িত মানুষরা আহার্য পায় তা দেখতেন। ব্যাবিলনে মেয়েরা অনেক বিষয়ে স্বাধীন ছিলেন। তাঁরা নাগরিক অধিকার ভোগ করতেন। ব্যাবিলনে

কোন কোন নারী বিচারকের পদও অলঙ্কৃত করেছেন। নিজেদের সম্পত্তির উপর তাঁদের কর্তৃত্ব ছিল। কিন্তু বহুক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় মেয়েদের অধিকার খর্ব করা হয়েছিল।

হামুরাবির বিধান ঃ ব্যাবিলনের এক সুপ্রসিদ্ধ রাজার নাম হামুরাবি। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় দুই হাজার বছর আগে হামুরাবি প্রজাদের মঙ্গলের জন্য কতকগুলি বিধির প্রচলন করেন। এই বিধি বা আইনগুলিকে আমরা হামুরাবির আইন বা বিধান বলতে পারি। ১৯০২ সালে প্রাচীন সুসা-নগরী খনন করার সময় একটি পাথরে খোদাই লিপিতে হামুরাবির আইন পাওয়া যায়। এই লিপিতে ২৮৫টি আইনের উল্লেখ আছে। হামুরাবির বিধিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ভূসম্পত্তি ও গৃহ, ব্যবসা ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থা আছে। এই আইনে পারিবারিক বিবাদ, শ্রমবিরোধ এবং হাঙ্গামাজনিত বিরোধের কথা বলা আছে। হামুরাবির লিপিতে দুর্বলের উপর শক্তিমানদের অত্যাচার বন্ধ করার কথা লেখা আছে। এইসব আইনে পিতৃমাতৃহীন শিশুদের ও বিধবাদের প্রতি সুবিচারের জন্য নির্দেশ আছে। প্রজাদের প্রতি হামুরাবি পুত্রের মত ব্যবহার করতেন।

হামুরাবির আইনে সমাজের চিত্র ঃ হামুরাবির আইনে তখনকার সমাজের কথা জানা যায়। জনগণের দেখাশুনা করার জন্য সৈন্যবাহিনী রাখা হ'ত। রাজধানীতে সুন্দর সুন্দর প্রসাদ আর মন্দির গড়ে উঠেছিল। সামাজিক শ্রেণীভেদ ছিল। আইনভঙ্গের জন্য কঠোর শাস্তি ছিল। বিত্তবান আর অভিজাতরা প্রভাবশালী ছিল। হামুরাবির আইনে মধ্যবিত্ত আরও দরিদ্রের কথা জানা যায়। এই যুগে নারী-স্বাধীনতার অনেক সুবিধে ছিল। কিন্তু আইনে পুরুষরা সুযোগ সুবিধা নারীদের থেকে বেশী পেয়েছিল। এই যুগে ঋণমুক্ত হ'বার জন্য পতি নিজের স্ত্রীকে মহাজনের ক্রীতদাসীতে পরিণত করতে পারত। ক্রীতদাসের ছেলেমেয়েদের স্বাধীন নাগরিকের অধিকার দেওয়া হ'ত। কৃষিনির্ভর ব্যাবিলনে হামুরাবির বিধিতে সম্পত্তি ও জলবিরোধ মীমাংসার বিপদ চিন্তা ছিল; হামুরাবির বিধি তখনকার দিনে সমাজ ও সভ্যতার চিত্র। এইরকম বিস্তারিত

আইন-কানুন করে সমাজের নানাস্তরের মানুষের সমস্যার সমাধানের চেষ্টা এর আগে কখনও করা হয় নি।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) ব্যাবিলনীয় সভ্যতা কাকে বলে ?
(খ) কোন সভ্যতার সংমিশ্রণে ব্যাবিলনীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ?
(গ) ব্যাবিলনের প্রধান দেবতার এবং শ্রেষ্ঠ রাজার নাম কি ?
(ঘ) জিগুরাত কাকে বলে ?
(ঙ) হামুরাবি কে ছিলেন ? হামুরাবির আইন কোথায় খোদাই করা আছে ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ধরনের প্রশ্ন :

১। ব্যাবিলনে কারা সভ্যতা গড়ে তুলেছিল ? এই সভ্যতাকে ব্যাবিলনীয় সভ্যতা বলা হয় কেন ?
২। ব্যাবিলনবাসী কেমন করে জমি চাষ-আবাদ করে ?
৩। ব্যাবিলনের বাণিজ্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৪। ব্যাবিলনীয়তে বিনিময় কি ভাবে হত ?
৫। ব্যাবিলনীয়রা বিদেশ থেকে বাণিজ্য করে কি কি পণ্য আনত ?
৬। ব্যাবিলনের বাণিজ্যে উন্নতির কারণ কি ছিল ?
৭। ব্যাবিলনের দেবদেবীর পরিচয় দাও।
৮। হামুরাবির বিধান বলতে কি বোঝ ? এই বিধানে কতগুলি আইনের উল্লেখ আছে ?

রচনাত্মক প্রশ্ন :

১। ব্যাবিলনের সমাজে পুরোহিতদের প্রভাব সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
২। প্রাচীন ব্যাবিলনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিজের ভাষায় লেখ।
৩। হামুরাবি কে ছিলেন ? তাঁর কয়েকটি আইন উল্লেখ কর। এই আইনগুলি কোথায় পাওয়া গেছে ? আইনগুলি থেকে কি সমাজচিত্র পাওয়া যায় ?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :
(ক) ব্যাবিলনের দেবতাদের প্রধান ছিলেন — ?
(খ) প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন —
(গ) ব্যাবিলনের এক সুপ্রসিদ্ধ রাজার নাম —।

২। প্রাচীন কালের রাজাদের মধ্যে কে প্রথম আইন কানুন সঙ্কলন করেন ? ডানদিকে √ চিহ্ন দিয়ে সঠিক উত্তরটি দেখাও :
তৃতীয় থটমোস ▭ ডেরিয়াস ▭ নেবুকডনেজার ▭ হামুরাবি ▭

[দুই] সাম্রাজ্যবাদী মিশরের ইতিবৃত্ত

[সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ ● পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্য]

সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ ঃ হামুরাবির রাজত্বের সমসাময়িককালে হিকসস্ নামে একদল সেমেটিক জাতির লোক মিশর আক্রমণ করে। খ্রীষ্ট-জন্মের প্রায় ১৬০০ বছর আগে হিকসস্‌রা মিশর থেকে বিতাড়িত হয়। হিকসস্‌দের বিরুদ্ধে যাঁরা নেতৃত্ব দেন তাঁরা একটি নতুন রাজবংশের পত্তন করেছিলেন। এই রাজবংশের রাজা বা ফ্যারাওরা ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী। ফ্যারাওদের সৈন্যরা লোহার মারণাস্ত্রের ব্যবহার শিখেছিল। তারা অশ্ব আর অশ্বচালিত রথে চড়ে যুদ্ধে যেত। এই নতুন মিশরীয় রাজবংশের রাজধানী হ'ল দক্ষিণ মিশরের থীবস্ নগর। এই যুগে বিভিন্ন রাজ্যজয়ের লুণ্ঠিত অর্থে থীবস নগরের অট্টালিকা, মন্দির ও প্রাসাদের শোভাবর্ধন করা হয়েছিল। মিশরে স্থাপত্য কীর্তির অতুলনীয় নমুনা হ'ল কর্ণাকের মন্দির।

এই নবসাম্রাজ্যের যুগ পশ্চিম এশিয়ার রাজ্যগুলির সঙ্গে মিশরের সুদীর্ঘ কালের সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। মিশরের সম্রাট প্রথম থোটমেস এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তাঁর আমলে সিরিয়া মিশরের পদানত হয়। তাঁর কন্যা রাণী হাতাসু পুরুষের বেশে রাজ্য চালাতেন। আফ্রিকার পূর্ব উপকূল দখলে আনবার জন্য তিনি অভিযান পাঠান। তাঁর পরবর্তী ফ্যারাও তৃতীয় থোটমেস সিরিয়ার বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি মিশরকে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার প্রধান শক্তিতে পরিণত করেন। তিনি একটি নৌবাহিনীও গঠন করেছিলেন। তিনি প্রায় বত্রিশ বছর অথবা তারও বেশী সময় রাজত্ব করেছিলেন। তৃতীয় থোটমেসের পর আর একজন বিখ্যাত ফ্যারাও হচ্ছেন তৃতীয় আমেন হোটেপ। সাম্রাজ্যের আয় থেকে তিনি অনেক বড় বড় প্রাসাদ, মন্দির



ফ্যারাও আখ-এন-আটন

আর পাথরের মূর্তি তৈরি করেছিলেন। এই রাজবংশের পরবর্তী ফ্যারাওদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন চতুর্থ আমেন হোটেপ। তিনি ফ্যারাও আখ-এন-আটন নামে পরিচিত।

চতুর্দশ শতকে মিশরের সাম্রাজ্যের সীমা ছিল উত্তর-পূর্বে কৃষ্ণ সাগর ও পারস্যের পর্বতমালা, পশ্চিমে গ্রীসের উপকূল আর ক্রীট এবং দক্ষিণে আরবের মরুভূমি।

আখ-এন-আটন কর্ণাকের মন্দিরের ইষ্টদেব আমুনের পূজারক পুরোহিত শ্রেণীর বিরোধিতা করেন। মিশরে বহু দেবদেবী ছিল! তিনি ঘোষণা করেন যে একমাত্র সূর্যদেবই উপাস্য। সূর্যদেব বা আটনের উপাসক বলে তিনি এই আখ-এন-আটন নামটি গ্রহণ করেন। পুরানো সংস্কারের সঙ্গে জড়িত থীবস্ ত্যাগ করে তিনি আখেট আটন্ (বর্তমান টেল-এল-অমরনায়) নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। শক্তিশালী পুরোহিত শ্রেণী, প্রাদেশিক শাসকরা এবং উপনিবেশগুলি তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। অতি অল্প বয়সে ১৩৬২ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

পরবর্তী ফ্যারাও দ্বিতীয় রামেসিসের আমলের কর্ণাক ও লাক্সোরের মন্দির বাড়ান হয়। এই সময় পুরানো দেবদেবী আর পুরোহিতরা তাদের পূর্বগৌরব ফিরে পান। এরপর থেকেই আরম্ভ হয় পুরোহিতরা তাদের বিলাসী ফ্যারাওদের দুর্বলতা দেশ আর প্রজা-সাধারণকে রসাতলে টেনে নিয়ে যায়। বিদেশীদের আক্রমণে মিশরের গৌরব রবি ম্লান হয়ে যায়।

পুরোহিত শ্রেণী ঃ মিশরের পুরোহিত শ্রেণীর ক্ষমতা ছিল অসীম। পুরোহিতদের প্রতিপত্তি ফ্যারাওদের থেকে কম ছিল না। আখ-এন-আটনের পতন থেকে এই সত্য আরও সুস্পষ্ট হয়েছে। পরবর্তী ফ্যারাওদের যুগে পুরোহিতদের ধনসম্পদ ও প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। পুরোহিতরা প্রায় ১০৭,০০০ ক্রীতদাস রেখেছিলেন। মিশরের ভাল চাষের জমির এক সপ্তমাংশ পুরোহিতদের ছিল। তাদের প্রায় ৫০০,০০০ গোধন ছিল এবং মিশরের ১৬৯টি শহর থেকে তারা রাজস্ব পেত। পুরোহিতদের সম্পত্তিতে সরকারী কর বসত না। রাজ্যে তাঁরাই প্রধান হয়ে উঠেছিলেন।

পুরোহিতদের অসীম ক্ষমতা ছিল। সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, চাষ-আবাদ সব ক্ষেত্রেই তাঁরা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। পরলোকের ভয় দেখিয়ে দেবতাদের নামে পুরোহিতরা মর্ত্যের দেবতার মতন সম্মান ও শক্তি লাভ করতেন।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) হিকসস্ কারা? হিকসসরা মিশর থেকে কবে বিতাড়িত হয়?

(খ) মিশরের কোন সম্রাট বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন?

(গ) চতুর্থ আমেন হোটেপ কি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন?

(ঘ) মিশরের সাম্রাজ্যসীমা কতদূর বিস্তৃত ছিল?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ধরনের প্রশ্ন :

১। নতুন মিশরীর রাজবংশের রাজধানীর নাম কি? কি ভাবে তার শোভা বর্ধন করা হয়েছিল?

২। ফ্যারাও তৃতীয় থোটমেসের সম্বন্ধে কি জান?

৩। মিশরে পুরোহিতদের প্রভাব প্রতিপত্তি কেমন ছিল? পুরোহিতদের 'ক্রীত-দাস' ও গোধনের সংখ্যা কত ছিল? কতগুলি শহর থেকে তারা রাজস্ব আদায় করতেন?

৪। মিশরের কোন ফ্যারাও ধর্ম সংস্কার করেন? ধর্মসংস্কারের পরিণতি কি হয়েছিল?

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। মিশরের সাম্রাজ্যবাদী নীতি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। রাজা তৃতীয় থোটমেসের কৃতিত্ব বর্ণনা কর।

৩। মিশরের পতন কি ভাবে হয়েছিল?

৪। মিশরীয় সমাজে পুরোহিতদের প্রভাব কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল?

৫। রাজা চতুর্থ আমেন হোটেপের ধর্মীয় সংস্কারের প্রধান উদ্দেশ্য কি ছিল?

৬। মিশরে পুরোহিত প্রাধান্য কিভাবে পুনঃস্থাপিত হয়েছিল?

[তিন] ইরাণ বা পারস্যের উত্থান

[পারসিক সাম্রাজ্য ● জোরস্তার]

পারসিক সাম্রাজ্য ঃ পারস্যের বর্তমান নাম ইরাণ। আর্যদের আগমন থেকে বর্তমান ইরাণের ইতিহাসের সূত্রপাত। অনেক পণ্ডিতের মতে খ্রীষ্টজন্মের প্রায় দেড়হাজার বছর আগে মধ্য এশিয়া থেকে মিড, পারসি, পার্থিয় প্রভৃতি আর্যরা দলে দলে ইরাণে প্রবেশ করে। মিডরাই প্রথম মিডিয়া নামে একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করে। তাদের রাজা ছিলেন কাইজারেক্সেস্। তিনি এশিয়া মাইনর থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব ৫২৩ সালে পারসিকদের নেতা কাইরাস প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নাম একিমিনিড বংশ। মিডিয়া, লিডিয়া, ব্যাবিলন, মিশর প্রভৃতি রাজ্যের ক্ষমতা প্রায় সমান ছিল। কিন্তু মিড ও পারসিকদের মিলনের ফলে পারসিক সাম্রাজ্য প্রতিবেশীদের থেকে বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠে। লিডিয়ার রাজা ক্রোসাস ভেবেছিলেন যে, তিনি পারসিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে রাজ্য বাড়াবেন। কিন্তু কাইরাসের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি পরাজিত ও বন্দী হলেন। ফলে লিড়িয়া পারস্যের পদানত হয়।

এইবার কাইরাস ব্যাবিলন আক্রমণ করে দখল করেন। এখন কাইরাসের সাম্রাজ্য ভারতের সীমা থেকে ভূমধ্যসাগর ও আরবদেশে পর্যন্ত বিস্তৃত হ'ল। কাইরাস তাঁর অধীনস্থ রাজ্য ব্যাবিলন প্রজাদের ধর্মপালনে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। যেসব ইহুদী ব্যাবিলনে আটক ছিলেন, কাইরাস তাঁদের দেশে ফেরার অনুমতি দিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৩০ সালে মধ্য এশিয়ার একটি বর্বর যাযাবর জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারান।

পরবর্তী সম্রাট ক্যাম্বেসেসের রাজত্বকালে পারস্যের সৈন্যবাহিনী মিশর জয় করে। ক্যাম্বেসেসের পরে অভিজাতরা প্রথম দারায়ুসকে সিংহাসনে বসান। দারায়ুস পারসিক সম্রাটদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর রাজধানীর নাম ছিল পার্সিপোলিস্। রাজত্বের প্রথম দিকেই তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা সেট্রাপদের স্ববশে আনেন। সাম্রাজ্যের যেসব অংশে তাঁকে এই কারণে অভিযান করতে হয় তাদের মধ্যে ছিল লিডিয়া, মিশর,

আসিরিয়া, আর্মানিয়া, ব্যাবিলন, মিডিয়া প্রভৃতি স্থান। পশ্চিম এশিয়াতে এর পর শান্তি স্থাপিত হয়। প্রথম দারায়ুস শকদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। দক্ষিণ রাশিয়া, আফগানিস্থান ও সিন্ধু উপত্যকা তাঁর সৈন্যদের পদভারে কম্পিত হয়েছিল। ইথোপিয়া থেকে চীনের সীমানা পর্যন্ত এবং ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে ভারত পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই বিশাল সাম্রাজ্য যাতে ভালভাবে শাসন করা যায় তার-জন্য রাজপথ ও বণিকপথ ছিল। যেমন সার্ডিস থেকে সুসা পর্যন্ত যাবার জন্য দেড়হাজার মাইল দীর্ঘ এই রকম একটি রাজপথ ছিল। প্রদেশগুলির সুশাসনের প্রতি দৃষ্টি রাখা হ'ত। দারায়ুসের জয়যাত্রার পথে প্রথম বাধা দিয়েছিল ছোট একটি গ্রীক রাষ্ট্র যার নাম এথেন্স। আইওনিয়ার গ্রীকরা দারায়ুসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিল, আর তাদের সাহায্য করেছিল এথেন্স। এথেন্সকে শাস্তি দিতে দারায়ুস এক বিশাল সৈন্য বাহিনী পাঠালেন। এই পারসিক সৈন্যবাহিনী এথেন্স থেকে কিছু দূরে ম্যারাথনে এথেনীয়দের হাতে পরাস্ত হল। (খ্রীঃ পূঃ ৪৯০)। আর একটি স্মরণীয় যুদ্ধ হ'চ্ছে থার্মপোলীর যুদ্ধ। এই যুদ্ধে দারিয়াসের ছেলে জেরাক্সস্ থার্মপোলিতে স্পার্টার বীর লিওনিডাস ও তাঁর তিনশত সঙ্গীকে, যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। এইবারে পারসিকরা স্থলযুদ্ধে জয়ী হ'লেও জলযুদ্ধে ব্যর্থ হয়। পারসিকদের গ্রীকজয়ের স্বপ্ন বিফল হয়। পরবর্তীকালে ম্যাসিডনের দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজান্দার পারস্য পদানত করেছিলেন।

জোরস্তার: পারসিকদের প্রাচীন কাহিনী থেকে জানা যায় যে, জোরস্তার ছিলেন প্রাচীন আর্যদের আদি বাসস্থলের (আরিয়ান বৈজো) একজন ঋষি ও জ্ঞানী পুরুষ। বর্তমান ঐতিহাসিকরা বলেন যে সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ দশম থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে জোরস্তার বা জরথুষ্ট্র নামে একজন মনিষী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আবির্ভাবের আগে পারসিকরা বহু দেবদেবীতে বিশ্বাসী ছিল। অনেক সময় তারা জীবজন্তুর আরাধনাও করত। এই যুগে ধর্মের নামে নানা কুপ্রথা চলত, আর এইসবের মূলে ছিল 'ম্যাগি' বা পুরোহিতরা। জোরস্তার বললেন আলো ও স্বর্গের দেবতা আহুর মাজদাই

হচ্ছেন একমাত্র উপাস্য। প্রথম দারায়ুসের আমল থেকেই জোরস্তারের ধর্মমত পারস্যের রাজকীয় ধর্মে পরিণত হয়। জোরস্তারের বাণী ও প্রার্থনা আবেস্তা নামে ধর্ম গ্রন্থে পাওয়া যায়। আবেস্তাকে পারসিকদের বেদ বলা যেতে পারে।

জোরস্তারের অনুরক্তদের জোরস্ত্রীয় ধর্মবিশ্বাসী বলা হয়। এই ধর্মে বলে দুনিয়াটা 'সৎ' ও 'অসৎ'-এর লড়াইয়ের ময়দান। পারসিকদের স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্বে বিশ্বাস ছিল। জোরস্ত্রীয়রা অগ্নিকে পবিত্রজ্ঞানে পূজা করত। জোরস্তারের মতে আহুর মাজদা সর্ব কর্ম ও গুণের আধার। আর অন্ধকারের শক্তিগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে আহ্রিমান। যারা পবিত্রমনের মানুষ তারা আহুর মাজদাকে অনুসরণ করে অনন্ত কষ্ট পায়। জোরস্ত্রীয়রা সূর্যের উপাসক কারণ সূর্যের আলো আহুর মাজদারই প্রকাশ। বর্তমানে পারস্যের ফার্স প্রদেশে ও বোম্বাই-এ মুষ্টিমেয় জোরস্ত্রীয় ধর্মাবলম্বী বসবাস করেন।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

(ক) ইরাণের আগে কি নাম ছিল?
(খ) কাইজারেক্সস্ কে ছিলেন?
(গ) পারসিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে?
(ঘ) পারসিক সম্রাটদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে?
(ঙ) জোরস্তার কে ছিলেন?
(চ) আবেস্তা কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ধরনের প্রশ্ন ঃ

১। পারসিক সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন কে করেছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে কি জান?
২। পারস্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজার নাম কি? তাঁর রাজধানী কোথায় ছিল?
৩। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্ববশে আনবার জন্য দারায়ুস কোথায় ছিল? অভিযান প্রেরণ করেছিলেন?
৪। গ্রীকদের বিরুদ্ধে দারায়ুসের অভিযান কি সফল হয়েছিল?
৫। জেরাক্সেস-এর গ্রীস অভিযান ব্যর্থ হল কেন?

৬। জোরস্তার কে ছিলেন? তাঁর আবির্ভাবের আগে পারসিকরা কি ভাবে ধর্মাচরণ করত?

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। পারসিক সাম্রাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।

২। পারসিক সম্রাটদের মধ্যে দারায়ুসের কৃতিত্ব সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩। পারস্য সম্রাটদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন? তাঁর বিষয়ে কি জান?

৪। জোরস্তার ধর্মমত সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১। পারস্য সাম্রাজ্য কে প্রতিষ্ঠা করেন?

ডান দিকে ✓ চিহ্ন দিয়ে সঠিক উত্তরটি দেখাও ঃ

ক্যাম্বেসেস □ দারায়ুস □ জারক্সেস □ সাইরাস □।

[চার] ইহুদীদের ইতিবৃত্ত

[● হিব্রুদের আদিকাহিনী ● মিশরে ইহুদীদের অনুপ্রবেশ ● মোজেসের নেতৃত্বে ইহুদীদের মিশর ত্যাগ ● দাসত্ব থেকে মুক্তি]

হিব্রুদের আদিকাহিনী ঃ ইহুদী বা হিব্রুরা সেমেটিক জাতির একটি শাখা। তাঁরা ছিলেন যাযাবর জাতি। ইহুদীদের ধর্মপুস্তক বা বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম বা ৪র্থ শতকে লেখা হয়। এই বই পড়ে ইহুদীদের প্রাচীন ইতিবৃত্ত, ধর্ম বা আচার ব্যবহারের কথা জানা যায়। অনুমান করা হয় যে, খ্রীষ্টপূর্ব হাজার বছর আগে মেসোপোটেমিয়ার 'উর' নামে একটা জায়গা থেকে হিব্রুদের পূর্বপুরুষ আব্রাহাম ভূমধ্যসাগরের পূর্বদিকে বসবাস শুরু করেন। ইহাই ছিল ইহুদীদের ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি ভূমি। কানান, প্যালেস্টাইন, জুডিয়া, ইজরাইল নানা নামে এই স্থানটি পরিচিত।

মিশরে ইহুদীদের অনুপ্রবেশ—মিশর থেকে ইরাক বা আনতোলিয়া থেকে মিশর যাতায়াতের পথে ছিল হিব্রুদের বাসভূমি। যুদ্ধের সময় এই পথ ছিল সৈন্যদের চলাচলের সড়ক। উত্তর ও দক্ষিণ থেকে সৈন্যরা অনেক সময় হিব্রুদের চাষের জমি আর ফসল নষ্ট করে দিত। তাই অন্নের

সংস্থানের জন্য তারা দলে দলে মিশরে অনুপ্রবেশ করে। হিক্‌সসদের সময়ে ইহুদীরা এই দেশে সমাদর পেয়েছিল। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে তারা মিশরে বসবাস শুরু করে এবং ক্রমে ক্রমে তারা সংখ্যায় বেড়ে যায়। কিন্তু হিক্‌সসদের পতনের পর ইহুদীরা মিশর থেকে বিতাড়িত হয়।

মোজেসের নেতৃত্বে ইহুদীদের মিশর ত্যাগঃ বিতাড়িত ইহুদীরা মোজেস নামে এক নেতার অধীনে নতুন বাসস্থানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ষোড়শ থেকে ত্রয়োদশ শতকে ইহুদীরা তাদের নতুন আবাসের সন্ধান শুরু করেছিল। লোহিত সাগর পার হয়ে উদ্বাস্তু হিব্রুরা সিনাই প্রান্তরে এসে পৌঁছায়। প্রায় ৪০ বছর পথে পথে ঘুরে অবশেষে তারা কানানে এসে স্থানীয় বাসিন্দাদের তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে আবার বসবাস শুরু করে।

মোজেসের প্রধান 'দশটি বাণী, বা 'টেন কমাণ্ডমেণ্টস' ইহুদীদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করত, এইগুলি মোজেসের কাছে যেহোবা বা ঈশ্বরের অনুজ্ঞা। অনুজ্ঞাগুলি হ'ল (১) যেহোবাই হচ্ছেন একমাত্র ঈশ্বর। (২) ঈশ্বরের কোন মূর্তি গড়ে তার পূজা চলবে না। (৩) বৃথা ঈশ্বরের নাম নেওয়া চলবে না। (৪) সপ্তাহে একদিন বিশ্রামের দিন বলে গণ্য হবে। (৫) বাবা মাকে সম্মান করতে হবে। (৬) হত্যা করবে না। (৭) নৈতিক অনাচার করবে না। (৮) পরস্ব অপহরণ করবে না। (৯) প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দেবে না। (১০) অপরের জিনিসের উপর লোভ করবে না।

দাসত্ব থেকে মুক্তিঃ ইহুদীদের মধ্যে প্রথমে রাজতন্ত্র ছিল না। 'জজ' নামক একশ্রেণীর শাসকরা গ্রাম্য মোড়লের মত বিচার করে হিব্রুদের শাসনদণ্ড পরিচালনা করতেন।

প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের অনবরত ফিলিস্তাইন জাতির ও অন্যান্য শত্রুর মোকাবেলা করতে হয়েছিল। যুদ্ধের ও শান্তির সময় নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তারা 'সল' নামে একজন রাজাকে নির্বাচিত করেন। ফিলিস্তাইনদের সঙ্গে যুদ্ধে 'সলের' মৃত্যু হয়। সলের পুত্র ডেভিড সিংহাসনে আরোহণ

করে জেরুজালেম দখল করেন। তিনি শত্রুদের পরাজিত করে রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁর পুত্র সলোমনের রাজত্বকালে ইহুদীদের বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছিল। সলোমন জেরুজালেমে যেহোবার মন্দির তৈরী করেন। তাঁর রাজত্বকাল ইহুদীদের ইতিহাসে স্মরণীয়। সলোমন ফিনিশিয় নগর টায়ারের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। তিনি জ্ঞানী ও গুণী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। মিশরের একজন ফ্যারাও তাঁর সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল আড়ম্বরপূর্ণ ছিল। কিন্তু প্রজারা করভারে পীড়িত হয়েছিল। ফলে তাঁর উত্তরাধিকারীদের সময় থেকে ইহুদীদের পতন শুরু হয়।

সলোমনের মৃত্যুর পরে দুইটি ইহুদী রাষ্ট্রের জন্ম হয়। একটির নাম ইজরাইল অপরটির নাম জুডা। এইভাবে দুইভাগে ভাগ হয়ে যাওয়ার ফলে ইহুদীরা দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে খ্রীষ্টপূর্ব ৭২১ সালে আসিরিয়ার সৈন্যরা ইজরাইল দখল করে এবং বহুসহস্র নরনারীকে বন্দী করে নিয়ে যায়। পরবর্তীকালে (খ্রীঃ পূঃ ৬০৪) ব্যাবিলনের সম্রাট নেবুকাদনেজার জুডা দখল করেন এবং জেরুজালেম ধ্বংস করেন। তিনি এই সময় দশ হাজার ইহুদীকে বন্দী করে ব্যাবিলনে প্রেরণ করেন।

তারপর খ্রীষ্টপূর্ব ৫৩৮ সালে পারসিক সম্রাট কাইরাস ব্যাবিলন জয় করেন। ইহুদীদের তিনি ব্যাবিলনে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এই সময় প্রায় সত্তর বছর ইহুদীরা ব্যাবিলনে ছিল। হিব্রুরা কাইরাসের অনুমোদন লাভ করে জেরুজালেমে ফিরে এল। ব্যাবিলনীয়দের কাছ থেকে ধর্ম, পুরাণ ও শিল্পকলার বিষয়ে হিব্রুরা জ্ঞান লাভ করেছিল। ফলে সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে তারা এখন অনেক অগ্রসর। দূরদর্শী মনিষীরা হিব্রুদের দুর্দিনে তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) ইহুদী কাদের বলা হয় ?

(খ) কোন ধর্মপুস্তক পড়ে ইহুদীদের সম্বন্ধে জানা যায় ?

(গ) হিব্রুদের পূর্বপুরুষদের নাম কি ?

(ঘ) ইহুদীরা প্রথমে কাকে রাজা বলে নির্বাচিত করেছিলেন ?

(ঙ) ইহুদীরা কত বছর ব্যাবিলনে ছিল ?

(চ) মোজেস কে ছিলেন ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ধরনের প্রশ্ন :

১। মিশরে ইহুদীদের অনুপ্রবেশ কি করে ঘটেছিল ?

২। পারসিক সম্রাট কাইরাস ব্যাবিলন জয় করে ইহুদীদের প্রতি কেমন ব্যবহার করতেন ?

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। ইহুদীরা কিভাবে মিশরে এসেছিল ? মিশরে ইহুদীদের অবস্থা কি হয়েছিল ?

সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :

(ক) মোজেস (খ) সলোমন

৭ গ্রীসের ইতিহাস

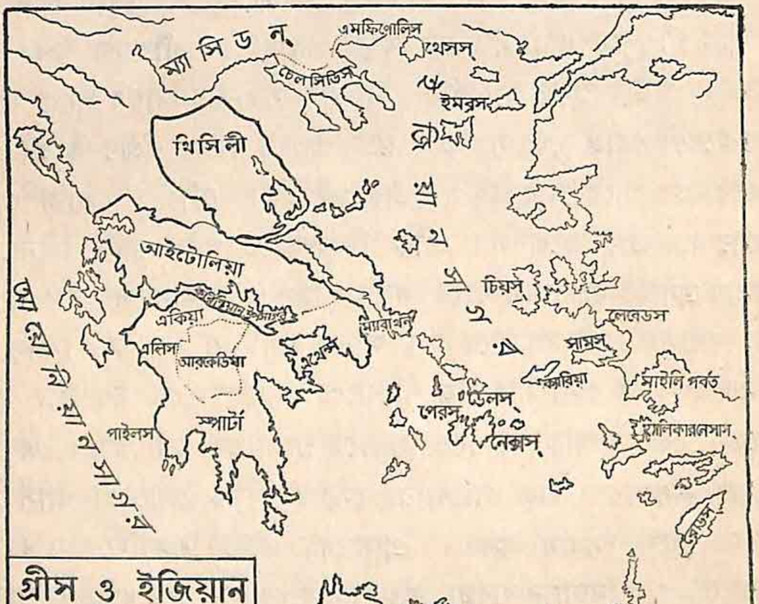
[● গ্রীসের উপর ক্রীটের সভ্যতার প্রভাব ● হোমসের যুগ ● নগর রাষ্ট্র সাংস্কৃতিক বিনিময় ● উপনিবেশ স্থাপন—এথেন্স ও স্পার্টা ● এথেন্সের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন ● স্পার্টার সামাজিক রাজনৈতিক জীবন ● এথেন্স ও স্পার্টার রেষারেষি ● সংস্কৃতি ও কৃষির ক্ষেত্রে এথেন্সের অগ্রগতি ● সাহিত্য ও শিল্পকলায় এথেন্সের অবদান ● এথেনীয় শিল্পকলা ও স্থাপত্য ● ধর্ম ● ম্যাসিডন ● আলেকজান্দারের দিগ্বিজয়—আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণ ● আলেকজান্দারের সাম্রাজ্যের পতন—রোম কর্তৃক গ্রীস জয়।]

গ্রীসের উপর ক্রীটের সভ্যতার প্রভাব—গ্রীসের অনতিদূরে ক্রীট ও ইজিয়ান দ্বীপপুঞ্জে একটি সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। গ্রীকদের উপর এই সভ্যতার প্রভাব সুদূর প্রসারী। ইজিয়ান সভ্যতার মানুষ ধাপে ধাপে প্রস্তর থেকে ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতার স্তরে এগিয়ে ছিল। খ্রীষ্ট জন্মের দুই হাজার বছর আগে থেকে এই সভ্যতার শুরু হয়। ক্রীটের সভ্যতা প্রায় হাজার বছর স্থায়ী হয়েছিল। গ্রীক কিংবদন্তীতে খ্যাত রাজা মিনোসের প্রাসাদ ক্রীটের কনোসাস শহরে অবস্থিত ছিল। কনোসাসের রাজপ্রসাদ ছিল বিশাল। এই প্রাসাদে ছিল অনেক ছোট ও বড় ঘর, সিঁড়ি ও অলিন্দ। রাজা রানী আর রাজ পরিবারের লোকেরা যে সব ঘরে বাস করতেন সেইগুলি আকর্ষণীয় দেওয়াল চিত্রে সুশোভিত করা হ'ত। এছাড়া স্বর্ণকার, মণিকার ও রাজ পরিবারের সেবায় নিযুক্ত লোকেরা প্রাসাদের অন্যান্য অংশে বসবাস করত। প্রাসাদেই একটি শিক্ষানিকেতন ছিল। প্রাসাদের জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা তৎকালীন যুগের কারিগরী দক্ষতার উৎকর্ষ প্রমাণ করে।

এই সভ্যতার অন্যান্য কেন্দ্রের মধ্যে ফায়েস্টাস ও ট্রয় নগরীর নাম করা যায়। অকস্মাৎ শত্রুর আক্রমণে ও দুর্ঘটনায় প্রাক-গ্রীক যুগের এই সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। ব্যবসা ও নৌবাণিজ্যে ইজিয়ান সভ্যতার মানুষ অভ্যস্ত ছিলেন। ক্রীটের মানুষ প্রকৃতি দেবীর আরাধনা করতেন। এই প্রকৃতি দেবীর পুত্র জিয়ুস গ্রীকদের মধ্যে দেবরাজ হিসাবে সম্মানিত

হয়েছিলেন। পরবর্তী যুগে গ্রীসের ভূখণ্ডে 'মাইসিনিয় সভ্যতা' ইজিয়ান সভ্যতারই অবদান। ক্রীটের সভ্যতার ধারা গ্রীক সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল।

শিল্পকলার কারিগরী দক্ষতার ক্ষেত্রে ও বাণিজ্যের প্রসারের জন্য মিশর ও ব্যাবিলনের কাছে ক্রীটের মানুষ ঋণী। গ্রাক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস রাজা মিনোসের একটি নৌবাহিনীর কথা বলেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে গ্রীকরা ক্রীটের সভ্যতার কাছে ঋণী। ক্রীটের শিল্পকলা ও সৌন্দর্যবোধ, কারিগরী বিদ্যা, নৌচালনা দক্ষতা, শহুরে আচার-আচরণ গ্রীকদের প্রভাবিত করেছিল।



গ্রীস ও ইজিয়ান দ্বীপপুঞ্জ

হোমারের যুগ—খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় হাজার বছর আগে ইজিয়ান সভ্যতার সঙ্গে গ্রীকদের যোগাযোগ হয়। গ্রীকরা ছিল আর্য ভাষাভাষী। তারা নিজেদের হেলেনী বলত। গ্রীকদের বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন দলে গ্রাসে আসে। এই সব গোষ্ঠীর মধ্যে একিয়ানরা অন্যতম। একজন একিয়ান নৃপতি এগামেমননের নেতৃত্বে গ্রীকরা ট্রয় নগর অবরোধ করে দখল করে।

গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়ড ও ওডিসীতে গ্রীকদের ট্রয় আক্রমণ ও সেখান থেকে ঘরে ফেরার কাহিনী পাওয়া যায়। কবি হোমার এই মহাকাব্যের লেখক বলে দাবী করা হয়। হোমার গ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকের কবি। বহু প্রাচীন যুগের প্রচলিত কাহিনী ও গাঁথা হোমারের নামের সঙ্গে বিজড়িত এই দুইটি মহাকাব্যে স্থান পেয়েছে।

হোমারের কাব্যে গ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ থেকে অষ্টম শতকের গ্রীক সমাজের চিত্র পাওয়া যায়। এই সময় ডোরিয়ান গোষ্ঠীর গ্রীকরা একিয়ান গ্রীকদের স্থান দখল করে। অভিজাতরা দেশের ভাল ভাল চাষের জমির মালিক ছিল। কৃষকদের ভাগে পড়ত অনুর্বর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষের জমি। তারা অপরের জমিতেও মজুরী খাটত। ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। রাজা ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান। তাঁকে পরামর্শ দিতেন অভিজাত বা প্রাচীনদের সমিতি। স্বাধীন নাগরিকদের সভায় যে কোন প্রশ্নের উপর মতামত দেওয়া যেত। কিন্তু এই সভায় কোন বিষয়ে আলোচনা করার অধিকার ছিল না।

নগর রাষ্ট্রঃ গ্রীসের পাহাড় ও পর্বতমালা দেশের বিভিন্ন অংশকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। তার ফলে প্রতিটি অঞ্চলের লোক প্রায় বাধ্য হয়েই নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। তাই গ্রীসে ছোট ছোট নগর রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। নগরের কেন্দ্রমূলকে পুর বা পোলিস বলা হ'ত। এইসব নগর রাষ্ট্রের জনসংখ্যা বেশী নয়। নগরের আশেপাশে গ্রামে ও ক্ষেতখামারে জনবসতি ছিল। এথেন্সের গৌরবের যুগেও তার জনসংখ্যা আড়াই লক্ষের বেশী ছিল না। নাগরিক মাত্রেই ভোট দিতে পারত। কিন্তু বৈদেশিকদের বা দাসদের এই অধিকার ছিল না।

সাংস্কৃতিক বিনিময়ঃ গ্রীকরা নানা গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রীকদের মধ্যে নানা ধরনের ঐক্যের সূত্র ছিল। ধর্ম, ভাষা ও জাতিগত ঐক্য গ্রীকদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের পথ সুগম করেছিল। প্যানহেলেনিক এই নামে সমস্ত গ্রীকদের ব্যাপার বোঝাত। হোমারের মহাকাব্য ছিল সকল গ্রীকদের প্রিয়। নানা খেলাধূলার মাধ্যমে গ্রীকরা পরস্পরকে জানতে পারত। এইসব খেলাধূলার মধ্যে অন্যতম অলিম্পিকের খেলা গ্রীষ্টপূর্ব ৭৭৬ সালে শুরু হয়। প্রতি চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত

অলিম্পিকে অংশ নেওয়া গ্রীকদের কাছে সম্মানের ব্যাপার ছিল। এছাড়া বিভিন্ন তীর্থস্থানে গ্রীকরা পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ লাভ করত। এইসব তীর্থের মধ্যে ডেলফীতে সূর্য দেবতা এপোলোর মন্দির প্রসিদ্ধ ছিল। ভবিষ্যদ্বাণী শোনবার জন্য দূর দূরান্ত থেকে গ্রীকরা এখানে সমবেত হত। প্যানহেলেনিক স্বার্থে গ্রীকরা অনেক সময় ঐক্যবদ্ধ হ'ত।

উপনিবেশ স্থাপন ঃ গ্রীক উপনিবেশগুলি অষ্টম থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে গড়ে ওঠে। গ্রীকরা ইজিয়ান ও কৃষ্ণসাগর তীরে, ইতালী ও সিসিলিতে, এমনকি স্পেন ও গলে (বর্তমান ফ্রান্সে) পর্যন্ত উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। অনেক সময় হোমারের কাব্যের নায়কের অনুকরণে অভিযান করে গ্রীকরা বিদেশে যেত। আবার খাদ্যের সন্ধান বা বাণিজ্যের জন্য দেশ ছেড়ে অনেকে বিদেশে যেত। রাজনৈতিক কারণে অনেকে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। ভূমিহীনরা অনেক সময় দেশের মায়া ত্যাগ করে বিদেশে যেত। বিদেশ যাত্রা স্বজাতি প্রীতির সৃষ্টি করে।

এথেন্স ও স্পার্টা ঃ গ্রীসে অনেক নগর রাষ্ট্র ছিল। এই সব নগর রাষ্ট্রের মধ্যে মধ্যগ্রীসের এথেন্স ও দক্ষিণ গ্রীসের স্পার্টা প্রসিদ্ধ ছিল। এথেন্স ছিল এটিকার প্রধান নগরী। এইখানে আইয়োনীয় গোষ্ঠীর গ্রীকরা বসবাস করত। স্পার্টায় ছিল ডোরিয়ান গ্রীকরা।

এথেন্সের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন ঃ এথেন্সের সমৃদ্ধির মূলে ছিল কৃষি ও নৌবাণিজ্য। অভিজাত ও ডেমস বা সাধারণ লোকেরা অর্থাৎ বণিক, নাবিক, কারিগর, কৃষকরা নাগরিক অধিকার ভোগ করত। বহিরাগতের এই অধিকার ছিল না। দাসেদের কোন অধিকারই ছিল না। এথেন্সে প্রাচীন কালে রাজতন্ত্র ছিল। ক্রমে অভিজাতরা রাজ্যের ক্ষমতা দখল করে। এরপরে এথেন্স গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এই গণতন্ত্রের স্রষ্টা ছিলেন সোলন। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯৪ সালে সোলন এথেন্সের সমাজ ও রাষ্ট্রের সংস্কার করেন। তিনি ঋণগ্রস্তদের দাসে পরিণত করার প্রথা অবলুপ্ত করেন ও জমির মালিকানার সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সোলন অভিজাত সভার বা এবিরোপগ্যাসের ক্ষমতা খর্ব করেন। তিনি জনগণের প্রতিনিধিদের বা একলেশিয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। সোলনের পরে

ক্লাইস্থিনিস গণতন্ত্রের ভিত্তি প্রসারিত করেছিলেন। এথেন্সে ১৪ বছর পর্যন্ত শিশু লেখাপড়া, গান-বাজনা শরীরচর্চা করত। মেয়েরা বাড়ীতে গৃহস্থালীর কাজ শিখত। ১৬ বছরের বালক ব্যায়ামে পটু হ'ত। এথেনীয়রা আঠারো থেকে দুই বছর সামরিক বিদ্যালাভের পর পূর্ণ নাগরিক হ'ত। এই শিক্ষায় তারা জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে পারত।

স্পার্টার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন : ডোরিয়ানরা ছিলেন স্পার্টার শাসকশ্রেণী। তাঁদের বংশবদ বহিরাগতরা পেরিয়োকিরা স্পার্টা নগরের আশেপাশে বাস করতেন। পেরিয়োকিদের নাগরিক অধিকার ছিল না। এছাড়া ছিল দাস বা হেলটরা। তাদের কোনরকম অধিকারই ছিল না। হেলটরা ভূমিদাস ছিল। কিংবদন্তী বলে যে, আইন প্রণেতা লাইকারগাস স্পার্টায় কতকগুলি নিয়মকানুন চালু করেন।

এইসব বিধি অনুসারে স্পার্টানরা সবসময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকত। স্পার্টায় সোনারূপার বদলে লোহার মুদ্রার চল ছিল। ছেলেবেলা থেকে স্পার্টানরা কঠোর নিয়মশৃংখলার মধ্যে মানুষ হ'ত। শরীর চর্চা ও যুদ্ধবিদ্যার অনুশীলন করাই স্পার্টানদের জীবনের লক্ষ্য ছিল। স্পার্টায় রাষ্ট্রের উপর ছিল শিক্ষার ভার। স্পার্টায় দুর্বল শিশুকে মেরে ফেলা হ'ত। অন্যান্যদের নিয়ে যাওয়া হ'ত সামরিক শিবিরে। সেখানে তারা স্বল্পাহারে, কঠোর পরিশ্রমে, কঠিন নিয়মে যুদ্ধবিদ্যা শিখত। স্পার্টায় জীবনের মোক্ষ ছিল দক্ষ সৈনিক হওয়া। তাই মেয়েরাও সামরিক শিক্ষা নিত, ফলে স্পার্টানরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হয়েছিল কিন্তু তাদের মন ছিল সংকীর্ণ।

স্পার্টায় দুইজন রাজা একসঙ্গে রাজত্ব করতেন। স্পার্টায় দুই রাজা ও ২৮ জন সদস্যের প্রবীণ সভা বা জেরুসিয়া আর সাধারণ নাগরিক সভা বা এপেলার নাম পাওয়া যায়। এছাড়া ছিলেন পাঁচজন নির্বাচিত ম্যাজিস্ট্রেট বা এফোর। জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে এফোররা রাজার উপর নজর রাখতেন।

এথেন্স ও স্পার্টার রেষারেষি : এথেন্স ও স্পার্টারের মধ্যে প্রথম

থেকে গ্রীসের নেতৃত্ব নিয়ে রেষারেষি ছিল। পারসিক রাজা দারায়ুস গ্রীস আক্রমণ করলে এথেনীয়রা এককভাবে ম্যারাথনে (খৃঃ পূঃ ৪৯০) পারসিক বাহিনীকে পরাজিত করেছিল। ফলে গ্রীকরা এথেনীয়দের ধন্য ধন্য করতে থাকে। প্রায় দশবছর বাদে দারায়ুসের ছেলে জেরাক্সেস্ গ্রীস আক্রমণ করেন। এই সময় পারসিকদের বাধা দান করতে গিয়ে থার্মপোলীর যুদ্ধে স্পার্টার রাজা লিওনিদাস ও তাঁর ৩০০ সঙ্গী বীরের মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করে জেরাক্সেসের বাহিনী এথেন্স দখল করে। অবশেষে এথেনীয়দের হাতে সালামিসের নৌযুদ্ধে পারসিক নৌবাহিনী পরাজিত হয়। ফলে তারা গ্রীসের মূল ভূখণ্ড ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। পারসিকদের হাত থেকে উপনিবেশের গ্রীকদের মুক্ত করার জন্য এথেন্সের নেতৃত্বে গ্রীক রাষ্ট্ররা পারসিক সম্রাটের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়। এই সংঘের নাম ডেলসের রাষ্ট্রজোট। এথেন্সের নেতৃত্বে ডেলসের রাষ্ট্রজোটের নৌবাহিনী ইজিয়ান অঞ্চল থেকে পারসিকদের বিতাড়িত করে। গ্রীকদের পারসিক আক্রমণের ভীতি দূর হবার পর এথেন্স ডেলসের রাষ্ট্রজোটের সদস্যদের প্রতি অধীনস্থ রাজ্যের মতন ব্যবহার শুরু করে ছিল। ফলে অতি অল্প কালের মধ্যে ডেলসের রাষ্ট্রজোট এথেন্সের সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। এথেন্সের শক্তি খর্ব করার জন্য স্পার্টা ও তার মিত্ররা তৎপর হয়ে পড়ল। এথেন্সের জননায়ক পেরিক্লিসের প্রতিভায় এথেন্স এক বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক হয়। এথেন্সের কৃষ্টি ও সমৃদ্ধি স্পার্টার ঈর্ষার কারণ হয়েছিল। তাছাড়া স্বতন্ত্রপ্রিয় গ্রীকরা এথেন্স প্রাধান্য মানতে চাইলে না। ফলে সুদীর্ঘ পেলোপনেশিয় যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধের একদিকে ছিল এথেন্স ও তার মিত্র রাষ্ট্ররা ও অন্যদিকে ছিল স্পার্টা ও তার মিত্ররা। পেলোপনেশিয় যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলে এথেন্সের-সাম্রাজ্যের পতন হয় (খ্রীঃ পূঃ ৪০৪)। কিন্তু এথেন্স তার সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্য গ্রীকদের মনে স্থায়ী স্থান অধিকার করেছিল। গ্রীকদের উপর স্পার্টার নেতৃত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। কারণ ক্রমেই উত্তর গ্রাসের একটি রাজ্য ম্যাসিডন গ্রীকজগতের সর্বাধিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল।

সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে এথেন্সের অগ্রগতি : পারসিক আক্রমণের

পর প্রায় একশ পঞ্চাশ বছরে মানবসভ্যতার ভাণ্ডারে গ্রীসের অবদান স্মরণীয়। এই যুগে সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে গ্রীসের নেতৃত্ব দিয়েছিল এথেন্স। এক কথায় বলা যেতে পারে যে, এই সময়ে গ্রীসের মধ্যমণি ছিল এথেন্স। পারসিক যুদ্ধের পরবর্তীকালে এথেন্সের প্রধান কর্ণধার ছিলেন পেরিক্লিস। পেরিক্লিসের (খৃঃ পূঃ ৪৯৫-২৯) নেতৃত্বে এথেন্স এক বিশাল নৌবাহিনী গড়ে তুলেছিল। তাঁর উদ্যমে এথেন্স নগরী স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে অতুলনীয় হয়ে ওঠে। পেরিক্লিসের যুগে দর্শন ও সাহিত্যে, নাটকে ও চিত্রকলায় এথেন্সের চরম উন্নতি হয়।


পেরিক্লিস

তিনি এথেন্সকে সমগ্র গ্রীসের শিক্ষায়তনে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সময়ে গণতন্ত্রের ভিত্তি প্রসারিত হয়। কিন্তু পেরিক্লিসের যুগে এথেন্সীয় সাম্রাজ্যের প্রসার গ্রীকদের মনে বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। ফলে স্পার্টা ও তার মিত্ররা এথেন্সের বিরোধিতা করে এবং পেলোপনেশিয় যুদ্ধের (খৃঃ ৪৩১-৪০৪) সূত্রপাত হয়।

সাহিত্য ও শিল্পকলায় এথেন্সের অবদান ঃ খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতকের গ্রীকসাহিত্য ও শিল্পকলায় এথেনীয়দের প্রতিভার সুস্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায়। এই যুগে নাটক জনপ্রিয় ছিল। নাট্যশালায় বহু নাটক মঞ্চস্থ হ'ত। গ্রীকদেবতা ডাওনিসাসের উৎসবে নাটকের অভিনয় ও সমবেত সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হ'ত। নাটকের ক্ষেত্রে এথেন্স অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিল। এথেন্সের অন্যতম নাট্যকার ছিলেন ইসকাইলাস। ইসকাইলাস প্রায় পঞ্চাশটি বিয়োগান্ত নাটকের লেখক। আরেকজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার সফোক্লিস এথেন্সের স্বর্ণযুগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর লেখা ১১৩টি নাটকের মধ্যে মাত্র ৭টির সন্ধান পাওয়া যায়। 'অডিপুস' তাঁর অন্যতম বিয়োগান্ত নাটক


হেরোডোটাস

এই যুগের আরেকজন প্রসিদ্ধ লেখক ইউরিপেডিস্। মিলনান্ত নাটক লেখকদের মধ্যে এরিস্টফার্ণেস জনপ্রিয় ছিলেন। ইতিহাস লেখায় গ্রীকরা অগ্রণী ছিল। ঐতিহাসিক হেরোডোটাসকে ইতিহাসের জনক বলা হয়। পারসিকদের গ্রীস আক্রমণের কাহিনী তাঁর লেখনীতে অমর হয়ে রয়েছে। তিনি পারসিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এশিয়া মাইনরে জন্মগ্রহণ করেন। বহু দেশে ভ্রমণ করে তিনি এথেন্সের স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছিলেন। পরবর্তী এথেনীয় ঐতিহাসিকের নাম থুকিডাইডিস। তাঁর লেখা পুস্তকের নাম পেলোপনেশিয় যুদ্ধ। থুকিডাইডিস এথেন্সের প্রতি সহানুভূতিশীল তৎসত্ত্বেও তাঁর বাস্তবনিষ্ঠ ইতিহাস বর্তমান ঐতিহাসিকদের পথ দেখিয়েছে।



এথেনার মূর্তি

এথেনীয় শিল্পকলা ও স্থাপত্য ঃ পেরিক্লিসের যুগে এথেন্সে চিত্রকলাঃ ভাস্কর্য ও স্থাপত্যে অভূতপূর্ব উন্নতি দেখা যায়। এথেন্স নগরীর কেন্দ্রস্থলে বিখ্যাত স্থপতি ইকটিনাস পার্থিনিয়নের মন্দিরের পরিকল্পনা করেন। এই মন্দির গাত্রে দেবরাজ জিয়ুসের কন্যা এথেনার কাহিনী খোদাই করা আছে। এথেনার মূর্তি গড়ার দায়িত্ব ছিল ভাস্কর ফিডিয়াসের উপর। ৩৮ ফিট উঁচু এই মূর্তির শোভাবর্ধনের জন্য হাতির দাঁত

ও সোনা ব্যবহার হয়েছিল। ফিডিয়াস এথেনার আর একটি ৭০ ফিট উঁচু ব্রোঞ্জের মূর্তিও তৈরি করেছিলেন।

জিয়ুসের মূর্তি ফিডিয়াসের আর একটি কীর্তি। এই যুগের এথেন্স শিল্পীদের তীর্থস্থান ছিল।

ধর্ম : গ্রীকরা দার্শনিক চিন্তায় অনেক অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু গ্রীসের সাধারণ মানুষ বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস করতেন। প্রতিটি গ্রীক, রাষ্ট্রের একজন করে আরাধ্য দেবতা বা দেবী ছিলেন। অলিম্পাস পাহাড়ে দেবতারা বাস করেন বলে গ্রীকদের বিশ্বাস ছিল। দেবতাদের প্রধান ছিলেন জিয়ুস। ডেল্‌ফীতে সূর্যদেবের বা এপোলার মন্দিরে বা অন্যান্য পবিত্র স্থানে দৈববাণী শোনা যায় বলে গ্রীকরা মনে করত। গ্রীসে অনেক ধর্মীয় উৎসব ও কুসংস্কার ছিল। দার্শনিক চিন্তায় গ্রীকরা অনেক উৎকর্ষ লাভ করেছিল। এই যুগে গ্রীকদের মধ্যে এক শ্রেণীর ভ্রাম্যমাণ শিক্ষকদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ধরনের শিক্ষকরা গ্রীসে সফিস্ট নামে পরিচিত ছিলেন। পেরিক্লিসের মৃত্যুর পরবর্তী যুগে এথেন্সে সক্রেটিস দার্শনিক হিসাবে সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তিনি সফিস্টদের মতন কোন বিশেষ বিষয় প্রচার বা শিক্ষাদান করেন নি। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন এবং সকল বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। তাঁর সুযোগ্য শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম: ছিলেন প্ল্যাটো। এথেন্সের শাসকশ্রেণী অল্পবয়স্কদের মধ্যে সক্রেটিসের প্রভাব দেখে ভীত হয়। তাঁরা বিচারের প্রহসন করে সক্রেটিসকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। সক্রেটিস হাসিমুখে বিষপান করে তখনকার প্রথা অনুযায়ী মৃত্যু বরণ করেন।



সক্রেটিস

ম্যাসিডন : উত্তর গ্রীসে ম্যাসিডন একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ম্যাসিডনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ সমগ্র উত্তর গ্রীস

পদানত করেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩৮ সালে করোনার যুদ্ধে ফিলিপ এথেন্স থেবস ও অন্যান্য কয়েকটি রাষ্ট্রকে পরাজিত করে তাঁর প্রাধান্য স্থাপন করেছিলেন। তিনি পারস্য জয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু তার আগেই গুপ্ত আততায়ীদের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়। ফিলিপের পুত্র আলেকজান্দার মাত্র বিশ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন। তিনি গ্রীসে ম্যাসিডন বিরোধী সমস্ত শক্তিকে পরাজিত করেন।

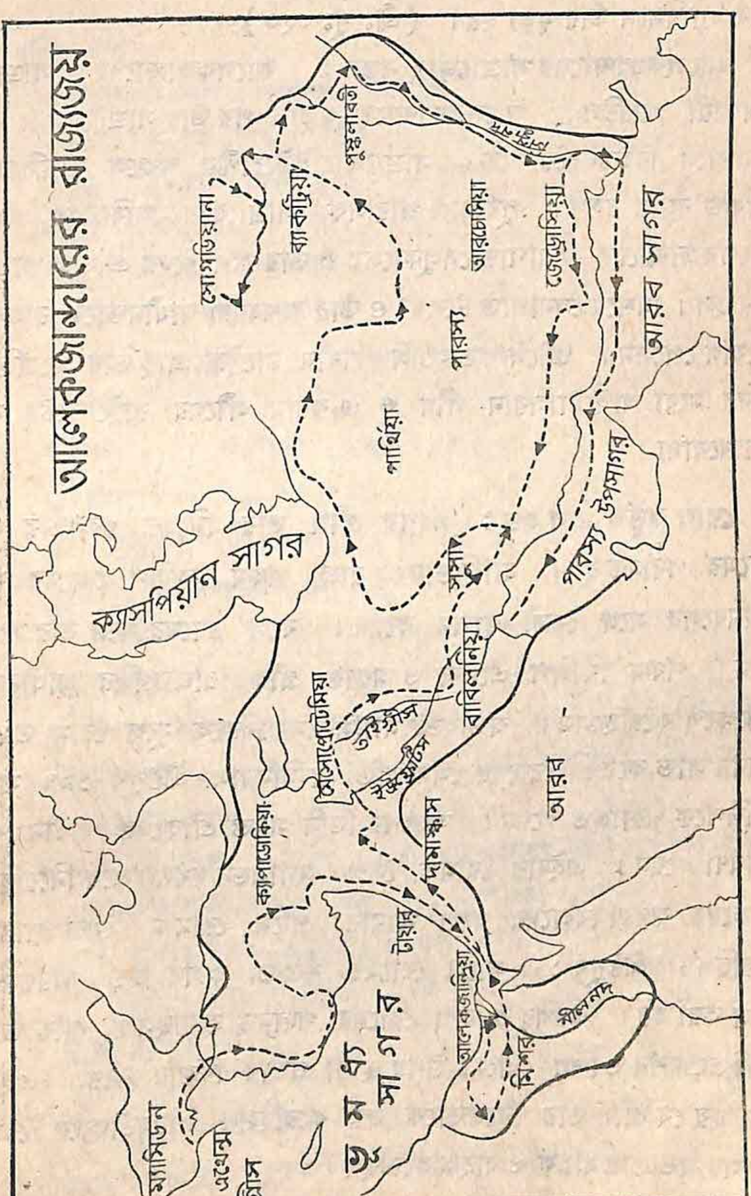
আলেকজান্দারের দিগ্বিজয় : আলেকজান্দার প্রথমেই পারসিক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হয়েছিলেন। পারসিক সম্রাটের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে আলেকজান্দার এশিয়া মাইনরের গ্রীকদের পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩৩ সালে ইসাসের যুদ্ধে পারসিক সম্রাট তৃতীয় দারায়ুস স্বয়ং আলেকজান্দারের হাতে পরাজয় বরণ করেছিলেন। এর পরে জেরুজালেম, গাজা ও মিশর আলেকজান্দারের দিগ্বিজয়ী বাহিনীর পদানত হয়েছিল। অতঃপর আলেকজান্দারের লক্ষ্য হল ব্যাবিলন। এইবার আরেকবার আলেকজান্দারের কাছে পরাজিত হয়ে দারায়ুস পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেছিলেন। আলেকজান্দার এই সময় পার্সিপোলিসের রাজপ্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করেছিলেন। তৃতীয় দারায়ুসও তাঁর মৃত্যুর পর পারসিক সম্রাটের হত্যাকারীকে অনুসরণ করে আলেকজান্দার সোগাডনিয়া ও ব্যাকট্রিয়া দখল করেন।



আলেকজান্দার

আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণ : খ্রীষ্টপূর্ব ৪২৭ সালে আলেকজান্দার ভারত আক্রমণ করেন। তক্ষশিলার রাজা অম্ভি তাঁকে স্বাগত জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু ঝিলম ও চিনাব নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে রাজা পুরু অসামান্য বীরত্বের সঙ্গে তাঁর বাহিনীকে বাধা দিয়েছিলেন। পুরু আলেকজান্দারের হাতে পরাজিত ও বন্দী হয়েছিলেন। আলেকজান্দার

তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মুক্তি দিয়েছিলেন। আলেকজাণ্ডার পুরুকে



তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। পুরুর সঙ্গে যুদ্ধের পরে গ্রীক সৈন্যরা

আর অগ্রসর হতে রাজী হ'ল না। ফলে গ্রীক বীর স্বদেশে যাত্রা করলেন। পথে ব্যাবিলনে তাঁর মৃত্যু হয়। (খ্রীঃ পূঃ ৩২৩)

আলেকজান্দারের সাম্রাজ্যের পতন : আলেকজান্দারের সাম্রাজ্য ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় অঞ্চলে ম্যাসিডনের প্রাধান্য বজায় রইল। পূর্বতন পারসিক সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অংশে আলেকজান্দারের সেনাপতি সেলুকাসের ও তাঁর বংশধরদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছিল। মিশরে সেনাপতি টলেমী ও তাঁর বংশধররা স্বাধীনভাবে রাজত্বের সুযোগ পেলেন। গ্রীসে কতকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। এদের মধ্যে আইটোলিয়ান লীগ ও একিয়ান লীগের রাষ্ট্রজোটের নাম উল্লেখযোগ্য।

রোম কর্তৃক গ্রীস জয় : এরপর গ্রীস তার নিজের দুর্বলতার জন্য রোমের পদানত হয়। ম্যাসিডনের রাজা পঞ্চম ফিলিপ রোমের শত্রু হ্যানিবলের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। ফলে রোমের সঙ্গে তার সংঘর্ষ বাধে। পঞ্চম ফিলিপ এথেন্স ও অন্যান্য গ্রীক রাজ্যগুলির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপে করেছিলেন। স্বভাবতই ম্যাসিডনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রোম তাদের সমর্থন লাভ করে। রোমের সেনাপতি ফ্লেমিনিনাস খ্রীষ্টপূর্ব ১৯৭ সালে ফিলিপকে পরাজিত করেন। অতঃপর তিনি সমস্ত গ্রীকদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। এইবার রোমক সৈন্য ম্যাসিডন দখল করে নিয়েছিল। গ্রীকদের ঝগড়া বিবাদের ফলে আবার গ্রীসে রোমান সৈন্য পাঠাতে হয়েছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৬ সালে রোমের শত্রুতা করার জন্য করিন্থনগরী ধ্বংস করা হয়। এরপর গ্রাকরা রোমের পদানত হয়েছিল। গ্রীক ভাষা, সাহিত্য, দর্শন ও শিল্প রোমের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। এইজন্য বলা হয় যে গ্রীস তার বিজেতাকে জয় করেছিল। পরবর্তীকালে রোমই গ্রীসের সভ্যতার ধারক ও বাহক হয়েছিল।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। ক্রীট সভ্যতা কোথায় বিকাশলাভ করেছিল ?
২। মিনোসের প্রাসাদ কোথায় ছিল ?
৩। ক্রীটের মানুষ কোন কোন দেবতার পূজা করত ?
৪। হোমারের লেখা মহাকাব্য দু'খানার নাম কি ?
৫। গ্রীসের নগরকেন্দ্রকে কি বলা হত ?
৬। প্যানহেলেনিক কথার অর্থ কি ?
৭। গ্রীসের নগর রাষ্ট্রের মধ্যে কোন কোনটি বিখ্যাত ছিল ?
৮। পেরিক্লিস কে ছিলেন ?
৯। ইনকাইলাস গ্রীসের ইতিহাস কি জন্য খ্যাত ?
১০। ইতিহাসের জনক কাকে বলে ?
১১। এথেনার মূর্তি কে তৈরী করেছিলেন ?
১২। গ্রীসের বিখ্যাত দার্শনিক কে ছিলেন ?
১৩। আলেকজাণ্ডার কে ছিলেন ? তাঁর পিতার নাম কি ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ধরনের প্রশ্ন ঃ

১। ক্রীটের সভ্যতার বিকাশ কোথায় হয়েছিল ? এই সভ্যতার দুই একটি কেন্দ্রের নাম বল। এই সভ্যতা কতদিন স্থায়ী হয়েছিল ? এই সভ্যতা কিভাবে বিনষ্ট হয় ?
২। হোমার কে ছিলেন ? তাঁর লেখা মহাকাব্য দুখানির নাম কি ? তাঁর লেখা কাব্য থেকে গ্রীক সমাজের কোন সময়কার চিত্র পাওয়া যায় ?
৩। গ্রীসে ছোট ছোট নগর রাষ্ট্র গড়ে ওঠার কারণ কি ?
৪। গ্রীকরা কোন কোন জায়গায় উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল ? এই উপনিবেশ স্থাপনের কারণ কি ছিল ?
৫। এথেন্সের কোন কোন শ্রেণীর লোকেরা নাগরিক অধিকার আর কারা অধিকার ভোগ করত না ?
৬। এথেন্সে গণতন্ত্রের স্রষ্টা কে ? তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রের কি কি সংস্কার করেন ?
৭। স্পার্টার শাসকশ্রেণীর নাম কি ? সাইকারগাস কি নিয়ম চালু করেছিলেন ?
৮। পেরিক্লিসের যুগে এথেন্সের কি কি উন্নতি হয়েছিল ?
৯। পেলোপনেশিয় যুদ্ধ শুরু হয়েছিল কেন ?

১০। হেরোডোটাসকে ইতিহাসের জনক বলা হয় কেন ?
১১। রাজা পুরুর অসামান্য বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তিনি পুরুর সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেছিলেন ?
১২। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্যের অবস্থা কি রকম হয়েছিল ?

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। ঈজিয়ান সভ্যতা সম্পর্কে যা জান লেখ।
২। হোমার কে ছিলেন ? হোমারীয় যুগের সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর।
৩। এথেন্সের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৪। স্পার্টারের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৫। এথেন্স ও স্পার্টারের মধ্যে সংঘর্ষের কারণ আলোচনা কর।
৬। পেরিক্লিস কে ছিলেন ? তাঁর নাম কেন বিখ্যাত ?
৭। সাহিত্য ও শিল্পকলায় এথেন্সের অবদান সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৮। আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৯। আলেকজান্দারের সাম্রাজ্যের পতনের কারণ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
১০। রোম ও গ্রীসের মধ্যে ঝগড়া বিবাদের কথা যাহা জান লেখ।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

[এক] শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

(ক) এথেন্স গণতন্ত্রের স্রষ্টা ——।
(খ) — স্পার্টান প্রভুদের ভূমিদান ছিল।
(গ) দারায়ুসের ছেলে — সসৈন্যে গ্রীস আক্রমণ করেন।
(ঘ) উত্তর গ্রীসের একটি রাজ্য — গ্রীক জগতের সর্বাধিক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল।
(ঙ) — কে ইতিহাসের জনক বলা হয়।

[দুই] 'হ্যাঁ' কি না লেখ ঃ

(ক) ইলিয়ড ও ওডেসী হোমারের লেখা দুই মহাকাব্যের নাম।
(খ) গ্রীসে ক্রীতদাস প্রথা ছিল না।
(গ) রাষ্ট্রের প্রধান প্রজা।
(ঘ) ইকটিনাস একজন স্থপতির নাম।
(ঙ) একজন প্রসিদ্ধ ভাস্করের নাম ফিডিয়াস।
(চ) হেরোডোটাসকে ইতিহাসের জনক বলা হয়।
(ছ) ধর্মের ক্ষেত্রে গ্রীকরা বহু দেবীতে বিশ্বাস করতেন না।

সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ ঃ

(ক) ইলিয়ড ও ওডিসী (খ) অলিম্পিক খেলা (গ) সোলন (ঘ) পেরিক্লিস ঙ) সক্রেটিস।

৮ রোম

[রোমের জন্মকাহিনী ● ইতালিতে প্রভুত্ব বিস্তার ● কার্থেজের সঙ্গে যুদ্ধ ● হ্যানিবলের ইতালি আক্রমণ ● আদি রোম সমাজ ● পাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান ● রোমের নাগরিকত্ব ● দাস প্রথা ও দাস বিদ্রোহ]

রোমের জন্ম কাহিনী : রোমের প্রচলিত কাহিনী অনুসারে রোমুলাস ও রেমাস নামে দুই যমজ ভ্রাতা টাইবার নদীর তীরে রোম নগরীর পত্তন করেছিলেন। রেমাসকে হত্যা করে রোমুলাস প্রথম রোমের রাজা হয়েছিলেন। রোমুলাসের পর ছয়জন রাজার নাম পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে সার্ভিয়াস টুলিয়াস প্রসিদ্ধ। তাঁর রাজত্বকালে ল্যাটিনদের সঙ্গে সন্ধির ফলে রোমের প্রভাব বেড়ে যায়। রোমের জনসাধারণকে তিনি ভূসম্পত্তির ভিত্তিতে ভাগ করেন। প্রথমে ইউট্রাসকানরা রোম অধিকার করেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে ল্যাটিনরা ইউট্রাসকান বংশীয় রাজাকে বিতাড়িত করে। কালক্রমে রোম সাধারণতন্ত্রে পরিণত হয়।

রোমের শ্রীবৃদ্ধি একদিনে হয়নি : স্যাবাইন, ইউট্রাসকান ল্যাটিন প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে রোমানরা মিশ্রজাতিতে পরিণত হয়েছিলেন। রোম ছিল প্রথমে ল্যাটিন লীগের একটি নগণ্য সদস্য। কালক্রমে ল্যাটিন লীগই রোমের অধীনস্থ হয়।

ধাপে ধাপে ইতালীতে প্রভুত্ব বিস্তার—খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম থেকে তৃতীয় শতাব্দীতে রোম ধীরে ধীরে সমগ্র ইতালীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। প্রথমে ইকুই, ইউট্রাসকান ও ভলসিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে টাইবার নদীর উভয় তীরে রোমের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে খ্রীষ্টপূর্ব ৩৯০ সালে উত্তরদিক থেকে দুর্ধর্ষ গল যোদ্ধারা সাময়িকভাবে রোম দখল করেছিল। রোমানরা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে গলদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। অতঃপর ল্যাটিন মিত্রদের পরাজিত করে ও দুর্ধর্ষ পাহাড়ী জাতি স্যামনাইটদের

বিরুদ্ধে জয়লাভ করে রোম মধ্য ইতালীতে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে দক্ষিণ ইতালীর গ্রীক উপনিবেশ টরেণ্টাম রোমের বিরুদ্ধে এপিরাসের রাজা পিরাসের সাহায্যপ্রার্থী হয়। পিরাস খ্রীষ্টপূর্ব ২৮০ সালে ইতালী আক্রমণ করেন। দুইবার তিনি রোমান সৈন্যদের পরাজিত করেন। অবশেষে বেনেভেণ্টামের যুদ্ধে হেরে গিয়ে পিরাস ইতালী ছেড়ে চলে যান। ফলে সমগ্র ইতালীতে রোমের প্রভুত্ব কায়েম হয়।

কার্থেজের সঙ্গে লড়াই ঃ ইতালী জয় করার পর ভূমধ্যসাগরের কূলে আর যেসব রাজ্য ছিল সেখানে রোম তার প্রাধান্য বিস্তার করতে চেয়েছিল। ফলে কার্থেজের সঙ্গে তার যুদ্ধ বাধে। কার্থেজ ছিল উত্তর আফ্রিকায় ফিনিশীয়দের একটি সমৃদ্ধ নগরী। ধন, জন, সম্পদ ও নৌশক্তিতে বলিয়ান কার্থেজ সার্ডিনিয়া, কর্সিকা ও সিসিলীর অধিকাংশ অঞ্চলে তার প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। রোম ও কার্থেজের যুদ্ধ শুরু হয় সিসিলিকে কেন্দ্র করে। এই যুদ্ধের নাম পিউনিক যুদ্ধ। পিউনিক যুদ্ধে কার্থেজের বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন হ্যানিবল।

খ্রীষ্টপূর্ব ২৬৪ সালে সিসিলিতে প্রাধান্যর প্রশ্নে প্রথম পিউনিক যুদ্ধ শুরু হয়। রোমানরা কার্থেজের বিরুদ্ধে স্থলযুদ্ধে জয়লাভ করে। কিন্তু নৌশক্তির অভাবে এই সংঘর্ষের সময় রোমের সৈন্যরা বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। পরে নৌবাহিনী গঠন করে রোমানরা কার্থেজীয় নৌশক্তি ধ্বংস করে। ফলে কার্থেজ বহু ক্ষতিপূরণ দিয়ে রোমের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিল। এই সময় সিসিলীতে রোমের প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

হ্যানিবলের ইতালী আক্রমণ ঃ প্রথম পিউনিক যুদ্ধের পর হ্যানিবলের পিতা হামিলকর স্পেনকে কার্থেজের ঘাঁটিতে পরিণত করেন। এইখান থেকে রোমের উপর আক্রমণ পরিচালনা করাই ছিল তার লক্ষ্য। হামিলকরের মৃত্যুর পর তার পুত্র হ্যানিবল খ্রীষ্টপূর্ব ২১৮ সালে আল্পস পর্বত পার হয়ে সসৈন্যে ইতালী আক্রমণ করেছিলেন। তিনি পরপর টিসিনাস, ট্রিবিয়া, ট্রাসিমেন ও ক্যানের যুদ্ধে রোমানদের পরাজিত করলেন। কিন্তু এইসব যুদ্ধে হ্যানিবলের বহু সৈন্যক্ষয় হয়েছিল। কার্থেজ তাঁকে বিশেষ কোন সাহায্য করতে পারেনি অতএব রোম জয়ের আশা তাঁকে ত্যাগ করতে হয়। ইতিমধ্যে

রোমের সেনাপতি সিপিও স্পেনে কার্থেজীয় সৈন্যদের যুদ্ধে হারিয়ে আফ্রিকায় অভিযান করেন। তখন হ্যানিবলকে কার্থেজ রক্ষার জন্য ইতালী ত্যাগ করতে হয়েছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ২০২ সালে হ্যানিবল ইতিহাস বিখ্যাত জামার যুদ্ধে সিপিওর হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। অতঃপর কার্থেজ রোমের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। কার্থেজের রণতরী, হস্তীবাহিনী ও উপনিবেশগুলি রোমের হস্তগত হয়।

যুদ্ধে পরাজয়ের পরও কার্থেজের বাণিজ্যের উন্নতি দেখে রোম ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৯ সালে রোম পুনরায় কার্থেজ আক্রমণ করে। ফলে তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। এই যুদ্ধে জয়লাভ করে রোমানরা কার্থেজ নগরীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিলেন।

আদি রোমক সমাজ ঃ আদি রোমক সমাজে পরিবারকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত। পরিবারকে কেন্দ্র করে সমাজ গড়ে উঠেছিল। পরিবারের কর্তার অসীম ক্ষমতা ছিল। পারিবারিক পরিধির বাইরে পিতা ও পুত্রের সমান অধিকার ছিল। পরিবারের বাইরে জনজীবনে গোষ্ঠীকে গুরুত্ব দেওয়া হত। রোমের আদি গোষ্ঠী ছিল তিনটি। প্রতিটি গোষ্ঠীকে আবার দশটি ভাগে বিভক্ত করা হত। তনটি গোষ্ঠীর মোট ত্রিশটি দলের প্রতিনিধি সভার নাম ছিল কিউরিয়েটা। রাজা সার্ভিয়াসের সময় ধনসম্পত্তির ভিত্তিতে নাগরিকরা এক নতুন ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। যার ফলে কমিসিয়া সেঞ্চুরিয়েটার সৃষ্টি হয়।

প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান ঃ রোমে উচ্চশ্রেণীর লোকদের বলত প্যাট্রিসিয়ান আর সাধারণ লোকদের বলত প্লিবিয়ান। গোড়া থেকে যারা রোমে বাস করছিল তাদেরই প্যাট্রিসিয়ান বলে দাবী করা হয়। আবার অনেকের মতে বাইরে থেকে যারা এসে রোম জয় করেছিল তারাই প্যাট্রিসিয়ান। প্যাট্রিসিয়ানরা সবরকম নাগরিক সুবিধা ভোগ করত। প্লিবিয়ানরা ছিল দরিদ্র। তারা চাকরীতে উচ্চপদ পেত না। প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ানদের মধ্যে বিবাহের চল ছিল না। প্লিবিয়ান মন্দিরে পুরোহিত হতে পারত না। যুদ্ধে বিজিত জমিতে প্লিবিয়ানদের ভাগ দেওয়া হত না। মুদ্রার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছিল।

নিজেদের অধিকার আদায় করার জন্য প্লিবিয়ানরা খ্রীষ্টধর্ম পঞ্চম থেকে তৃতীয় শতক ধরে লড়াই করেছিলেন। প্লিবিয়ানদের লড়াই ছিল শান্তিপূর্ণ ও আইনমাফিক। এইভাবে প্লিবিয়ানরা সব রকমের সুযোগ ও সুবিধা আদায় করেছিল। প্লিবিয়ানদের অধিকার রক্ষার জন্য যে সব আইন বিধিবদ্ধ হয় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দ্বাদশ দফা আইন। কালক্রমে কন্সাল বা সর্বোচ্চ শাসকের কাজ সহ সকল পদে প্লিবিয়ানদের নির্বাচিত হবার আর কোন বাধা রইল না। ধনী প্লিবিয়ানরা তখন অভিজাতদের সঙ্গে মিশে গেল আর দরিদ্ররা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রইল।

রোমের নাগরিকত্ব ঃ প্রথমে রোমের তিনটি গোষ্ঠীর লোকের মধ্যে নাগরিক অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল। কালক্রমে নিয়ম হলে যে ১৫ বছর বয়স হলে, বিদেশী বা ক্রীতদাস ছাড়া সকলেই নাগরিক অধিকার পাবে। বিদেশীদের রোমের নাগরিকত্ব পেতে হলে অনেক সাধ্যসাধনা করতে হত। নাগরিকদের উপর জবরদস্তী বা অত্যাচার করা নিষিদ্ধ ছিল। ষোল থেকে ষাটের মধ্যে যে কোন নাগরিককে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে বলা যেত। অন্ততঃ দশ-বছর সৈনিকের কাজ না করলে রাজনৈতিক-পদে প্রার্থী হওয়া যেত না। রোমের প্রাচীন নাগরিক প্রতিনিধির সভার নাম ছিল কমিশিয়া কিউরিয়েটা। আরেকটি প্রতিনিধি সভা কমিশিয়া সেঞ্চুরিয়েটাতে ধনসম্পদের ভিত্তিতে রোমান নাগরিকদের প্রতিনিধি নেওয়া হত। এছাড়া ছিল বিজ্ঞ ও প্রাচীন নাগরিকদের সভা বা সেনেট।

ক্রীতদাস-প্রথা ও ক্রীতদাস বিদ্রোহ ঃ অনেক যুদ্ধে জয়লাভের ফলে রোম বহু ধনসম্পদ ও অজস্র ক্রীতদাসের মালিক হয়েছিল। আর একদিকে হ্যানিবল যখন ইতালী আক্রমণ করেছিলেন সেই সময় থেকে গ্রামের মানুষ শহরের বাসিন্দা হয়েছিল। তাদের ক্ষেতে ধনীদের খামার গড়ে উঠেছিল। ক্রীতদাসেরা আধপেটা খেয়ে এইসব খামারে কাজ করত। রোমের সমাজে প্রভু ও দাস এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। দাসেরা পশুর অধম জীবনযাপন করত। ফলে তারা মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হত। খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৬ সালে সিসিলীতে একটি ক্রীতদাস-বিদ্রোহ দমন করতে তিনবছর সময়

লেগেছিল। এইসব বিদ্রোহের মধ্যে খ্রীষ্টপূর্ব ৭৫ সালে স্পার্টাক্যাসের বিদ্রোহ অন্যতম। স্পার্টাক্যাস ক্যাপুয়া শহরে ৮০ জন মল্লযোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে বিসুবিয়াস পর্বতে ঘাঁটি করেছিলেন। ক্রমে প্রায় লক্ষাধিক সৈন্য সংগ্রহ করে তিনি রোমের সৈন্যবাহিনীকে বার বার পরাজিত করেন।



দাঁড়ির কাজে নিযুক্ত রোমের ক্রীতদাস

বিদ্রোহীরা রোমের দিকে আসতে পারত। কিন্তু তারা গিমিলীতে যাওয়া স্থির করেছিল। এই সময় বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনীকে রোমানরা পরাজিত করে। স্পার্টাকাস রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছিলেন। এইসব ক্রীতদাস-বিদ্রোহ রোমের রাষ্ট্র ও সমাজের দুর্বলতার অন্যতম লক্ষণ।

সাম্রাজ্যবাদী রোম

[● জুলিয়াস সিজার ও রোমান গণতন্ত্রের অবসান ● নব প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য — ● রোমান সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ ● রোমান সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন ● খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুত্থান।]

জুলিয়াস সিজার ও রোমান গণতন্ত্রের অবসান ঃ খ্রীষ্টজন্মের ঠিক একশ বছর আগে রোমের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জুলিয়াস সিজারের জন্ম

হয়। বীর যোদ্ধা, রাজনৈতিক ও দক্ষ কূটনৈতিক হিসাবে সিজারের নাম স্মরণীয়। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯ সালে তিনি রোমের কন্সাল নিযুক্ত হয়েছিলেন।



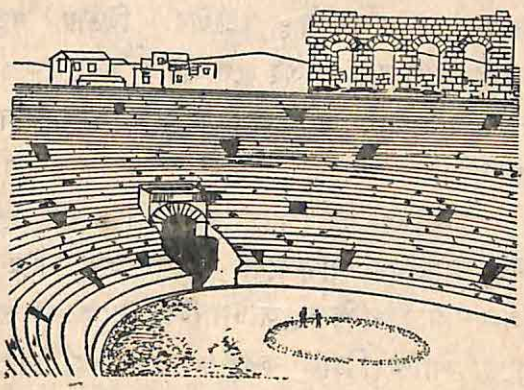
জুলিয়াস সিজার

একবছর কন্সাল থাকার পর তিনি গলের শাসনকর্তার পদ গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক কারণে সিজারকে নাম করা সেনাপতি পম্পে ও সবচেয়ে বড় ধনী ক্রেসাসের সঙ্গে জোট বাঁধতে হয়েছিল। গলের দুর্ধর্ষ জাতিদের দমন করার কাজে প্রায় সাত বছর সিজারকে লড়াই করতে হয়। এই সময় তিনি সসৈন্যে দুইবার ব্রিটেনে উপস্থিত হন। গলে তাঁর সাফল্য পম্পের ঈর্ষার কারণ হয়। সিজার-পম্পের বিরোধের ফলে যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তাতে অবশেষে সিজার জয়লাভ করেন। ফারাসেলাখের যুদ্ধে (খ্রীঃ পূঃ ৪৮) পরাজিত হয়ে পম্পে মিশরে পলায়ন করেন। এইখানে তিনি আততায়ীর হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন। এর পরে সিজার মিশর, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর পদানত করেন, এখন থেকেই সিজারই হলেন রোমের সর্বেসর্বা। এখন থেকে সেনেটও জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতার ছায়া মাত্র অবশিষ্ট রইল। সিজার যে সমস্ত সংস্কার করেছিলেন তাতে জনগণের অনেক সুরাহা হয়েছিল। তাঁর একক ক্ষমতালাভে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হচ্ছে মনে করে অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৪ সালে ব্রুটাস, কেসিয়াস ও আরও কয়েকজন জুলিয়াস সিজারকে সেনেটের সভায় হত্যা করেন। কিন্তু এতে গণতন্ত্র রক্ষা পায়নি।

গণতন্ত্রের অবসান : রোম নগরীর গণতন্ত্র ছিল একটি ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রের উপযোগী। সাম্রাজ্য বৃদ্ধির ফলে রোমে প্রচুর ধনসম্পদ ও ক্রীতদাসের সমাগম হয়েছিল। ফলে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছিল। দরিদ্র নাগরিকদের ভোট পাবার জন্য বিত্তবানরা তাদের নানা প্রলোভন দেখাত ও

সুযোগ-সুবিধা দিত। যুদ্ধে জয়লাভের পর সেনানায়করা অনেক সময় সেনেটের কথা অগ্রাহ্য করতেন। মুষ্টিমেয় অভিজাতরা ক্ষমতালোভে ভাড়াটে মল্লযোদ্ধা নিয়োগ করতেন। সিজার-পম্পের গৃহযুদ্ধের আগেও রোমে অনেকবার ক্ষমতালোভে দলবাজী, মারামারি ও খুনোখুনি হয়েছে। এইসব কারণের জন্য রোমে গণতন্ত্রের ধ্বংসের পথ সুগম হয়েছিল। সিজারের মৃত্যুর পর আরেকবার রোমে গৃহযুদ্ধ শুরু হল। এই গৃহযুদ্ধ রোমের গণতন্ত্রের কবর রচনা করেছিল।

নব প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য ঃ সিজারের মৃত্যুর পর তাঁর অনুগত মার্ক এণ্টনী ও ভাগিনেয় অক্টোভিয়াস সিজারের শত্রুদের পরাজিত করেন। অক্টোভিয়াস সম্রাট অগস্টাস উপাধি নিয়ে এক নতুন রোমান সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। অতি অল্পকালের মধ্যে যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি মার্ক এণ্টনীর অধিকৃত রাজ্যগুলিও কুক্ষিগত করেন। সম্রাট অগস্টাস সেনেটের



এ্যাম্পিথিয়েটার

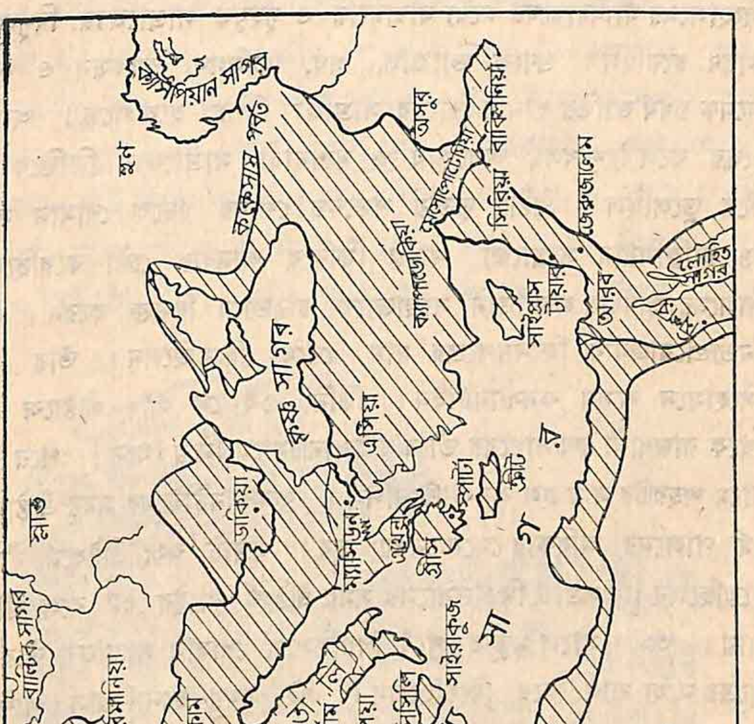
মানমর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করে একে একে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা হস্তগত করেন। অগস্টাস প্রায় ৪৫ বছর রাজত্ব করেন। তিনি যে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন তা প্রায় তুইশত বছর ভালভাবেই টিকে ছিল। অগস্টাসের সময়ে ঐতিহাসিক লিভি মহাকাব্য ঈনীদ রচয়িতা ভার্জিল, কবি হোরেস ও পৌরাণিক কাহিনীকার ওবিদ প্রভৃতি অনেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

অগস্টাসের সময়ে রোমে অনেক সুন্দর সুন্দর শ্বেত পাথরের সৌধ গড়ে ওঠে। সাধারণ জনসাধারণকে তুষ্ট রাখার জন্য অনেক সময় বিনা ব্যয়ে খাদ্য বিতরণ করতেন। জনগণের মনোরঞ্জনের জন্য অগস্টাস রোমে নানা খেলাধূলার সুবন্দোবস্ত করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে যীশুখ্রীষ্টের জন্ম হয়।

পরবর্তী সম্রাট টাইবেরিয়াসের (১৪-৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) সময়ে যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এই বংশের আর একজন রাজা নিরোর নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারে প্রজারা অতিষ্ঠ হয়েছিল। তাঁর রাজত্বকালে প্রলয় অগ্নিকাণ্ডে রোম ভস্মীভূত হয়। রোম নগরীকে এরপর নতুন করে গড়তে হয়েছিল। খ্রীষ্টাব্দ ৬৯ সালে সেনাবাহিনীর প্রধান ভেসপেসিয়ান রোমে ক্ষমতা দখল করেন। তাঁর পুত্র টাইটাস বিদ্রোহী ইহুদীদের বিরুদ্ধে অভিযান করে জেরুজালেম শহর ধ্বংস করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে এই রাজবংশের শাসনকালকে ফ্লেবিয়ান সম্রাটদের যুগ বলা হয়।

রোমান সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ : খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতককে রোমান সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ বলা যায়। এই যুগে খ্রীষ্টাব্দ ৯৬ থেকে ১৮০ সাল পর্যন্ত নার্ভা, ট্রাজান, হাড্রিয়ান, এণ্টনিয়াস ও মার্কাস আরেলিয়াস এই পাঁচজন রোমান সম্রাট রাজত্ব করেন। তাঁরা সুশাসক বলে সুনাম অর্জন করেছিলেন। ট্রাজানের সময় সাম্রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি হয়। এই যুগের শেষার্ধে বর্বর জাতিদের আক্রমণের আগে পর্যন্ত, উত্তরে স্কটল্যাণ্ড থেকে দক্ষিণে নীলনদ আর পশ্চিমে আটলান্টিক থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত রোম সাম্রাজ্যে শান্তি বিরাজ করত। সম্রাট হাড্রিয়ানের রাজত্বকাল শাসন সংস্কারের জন্য বিখ্যাত। এণ্টনিনাস ধার্মিক ও প্রজারঞ্জক শাসক ছিলেন। মার্কাস অরেলিয়াস দার্শনিক প্রকৃতির ছিলেন। পার্থিয়ানদের বিরুদ্ধে আর দানিয়ুব নদীর সীমান্তে বর্বর জাতিদের দমন করার জন্য তাঁকে সুদীর্ঘকাল যুদ্ধ করতে হয়েছিল। রোমের এই বিশাল সাম্রাজ্যে আর্থিক উন্নতি ক্রীতদাসদের শ্রমের উপর নির্ভর করত। রোমান সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলিতে এবং নাগরিক-জীবনে সচ্ছলতা দেখা দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হয়, শিল্পের উন্নতি হয়। কিন্তু সীমান্ত রক্ষার

ব্যয় বৃদ্ধির জন্য জনসাধারণকে অতিরিক্ত কর দিতে হ'ত। এই যুগে দাসশ্রমের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়।



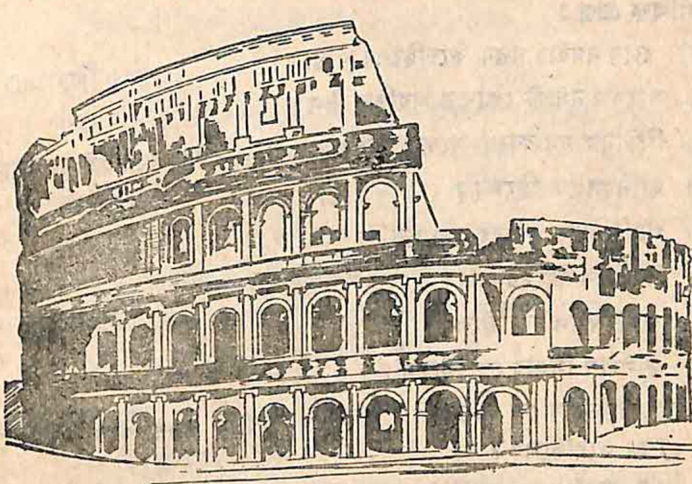
রোমান সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন : খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক থেকে

রোমান সাম্রাজ্যের অবনতির লক্ষণ সুস্পষ্টরূপে দেখা দেয়। ১৮০-৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ৬০ জনেরও বেশী সম্রাট রোমের সিংহাসনে বসেছিলেন। সিংহাসনের দাবিদারদের মধ্যে মারামারি ও গৃহযুদ্ধ সাম্রাজ্যের বিশৃংখলার কারণ হয়েছিল। ফ্রাংক ভ্যাণ্ডাল, গথ, ভিসিগথ, স্যাকসন ও আরো অনেক দুর্ধর্ষ জাতির হানায় রোমের সাম্রাজ্য বিপন্ন হয়ে পড়ে। অনবরত যুদ্ধের ফলে বিশৃংখলা, অসন্তোষ ও মহামারী সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে দুর্বল করে তুলেছিল। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের শেষের দিকে রোমান সম্রাট ডোয়োক্লিসিয়ান সাম্রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিলেন। শাসনের সুবিধার জন্য তিনি সাম্রাজ্যকে চারভাবে বিভক্ত করেন। তিনি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেঁধে দিয়েছিলেন। তাঁর পরে সিংহাসনে বসেন কনস্টানটাইন। তিনি ১১ই মে ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে রোম থেকে রাজধানী কৃষ্ণসাগরের তীরে বাইজানটিয়ামে নিয়ে যান। পরে তাঁর নামে শহরটির নাম হল কনস্টান্টিনোপল। কনস্টানটাইনের সময় খ্রীষ্টানদের ধর্ম পালনের অধিকার মেনে নেওয়া হয়। সম্রাট স্বয়ং খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। সম্রাট থিওডিসাসের সময় খ্রীষ্টধর্ম রাষ্ট্রের ধর্ম বলে স্বীকৃতি পায়। ৩৯৫ সালে মৃত্যুর পূর্বে থিওডিসাস রোমান সাম্রাজ্য তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। এই সময় হনোরিয়াস পশ্চিমের রোমক সাম্রাজ্যের মালিক হলেন। এখন থেকে কনস্টান্টিনোপল পূর্বের রোমক সাম্রাজ্যের কেন্দ্র হ'ল।

রোম সাম্রাজ্যের পতন ঃ ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে গথদের নেতা আলারিক রোম লুণ্ঠন করেন। পরবর্তী অর্ধশতকে পশ্চিমের রোমক সাম্রাজ্য বর্বর জাতির আক্রমণে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ভ্যাণ্ডালরা উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন, অ্যাংগেল, স্যাকসন ও জুটরা ব্রিটেন ও ফ্রাংকরা গল দখল করেছিল। ভ্যাণ্ডালরা রোম নগরী লুণ্ঠন করতে ছাড়ে নি। ইতিমধ্যে হুণনেতা এটিলা তাঁর দুর্ধর্ষ অনুচরদের নিয়ে ইউরোপে হানা দিয়েছিলেন। ফ্রাংক, গথ ও অন্যান্য বর্বর জাতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে রোমানরা এটিলাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। কিন্তু এতে পশ্চিমের রোমক সাম্রাজ্য রক্ষা পেল না। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমান সম্রাটের ভাড়াটিয়া জার্মান সৈন্যদলের সেনাপতি

ওডিসার সম্রাট রোমুলাস আগস্টুলাসকে সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন। ফলে পশ্চিমের রোমক সাম্রাজ্যের পতন হয়। পূর্বের সাম্রাজ্য ৪৫৩ সালে তুর্কীদের কনস্টান্টিনোপল বিজয় পর্যন্ত তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল।

খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুত্থান ঃ প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যে বহু দেবদেবীর পূজা-অর্চনা প্রচলিত ছিল। আবার গ্রীক দর্শন পাঠ করে তাঁদের মনে নানা প্রশ্ন জেগেছিল। এই সময় সম্রাট অগস্টুসের রাজত্বকালে জেরুজালেমের বেথেলহেমে যীশু খ্রীষ্টের আবির্ভাব হয়। পিতা যোসেফ ও মাতা মেরীর সঙ্গে তিনি নাজেরাথে বসবাস করতে আসেন। যীশু বললেন, ঈশ্বর সকলের পিতা ও তিনি তাঁর পুত্র। গরীব, দুঃখী, অন্ধ, খঞ্জ, রুগ্ন ও ব্যথিতের কাছে



রোমান কলোসিয়াম

পৌঁছেছিল তাঁর অমৃত বাণী। তিনি ভক্তির পথকে যুক্তির পথ বলে নির্দেশ দিলেন। ক্রুদ্ধ হ'ল ইহুদীদের পুরোহিতরা। রাজ্যের শত্রু বলে যিশুর বিরুদ্ধে তারা অভিযোগ আনল। রোমান শাসনকর্তা পিলেতের কাছে তাঁকে বিচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হ'ল। বিচারে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। মানবকল্যাণে যীশু প্রাণ দিলেন। যীশুর অনুরাগীদের ক্রীশ্চান বলা হয়। সেণ্ট পল নামে যীশুর অন্যতম শিষ্যের প্রচেষ্টায় অতি অল্পকালের মধ্যে এশিয়া মাইনর গ্রীস এমন কি রোমে

ক্রীশ্চানদের ধর্মস্থান বা চার্চ স্থাপিত হয়েছিল। রোমান সম্রাটরা ক্রীশ্চানদের উপর নানা অমানুষিক অত্যাচার শুরু করেন। এমন কি এ্যাম্পিথিয়েটারে বা কলোসিয়ামে হিংস্র পশুদের মুখে নিরস্ত্র ক্রীশ্চানদের এগিয়ে দিয়ে রোমানরা অনেক সময় নিষ্ঠুরভাবে মজা দেখতেন। ধর্ম পুস্তক বা বাইবেলের বাণী আর যীশুকে স্মরণ করে ক্রীশ্চানরা হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করত। অবশেষে তাঁদেরই জয় হল। রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন স্বয়ং খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হলেন। পরবর্তীকালে সম্রাট থিওডিসাসের সময় খ্রীষ্টধর্ম রাষ্ট্রের ধর্ম বলে স্বীকৃতি পেল।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) রোম নগরীর পত্তন করেছিলেন কারা ?

(খ) কার্থেজ নগরটি কোথায় অবস্থিত ছিল ?

(গ) পিউনিক যুদ্ধ কাদের মধ্যে হয়েছিল ? কাকে কেন্দ্র করে এই যুদ্ধ হয়েছিল ?

(ঘ) হ্যানিবল কে ছিলেন ?

(ঙ) প্যাট্রিসিয়ান কাদের বলা হত ?

(চ) প্লিবিয়ান কাদের বলে ?

(ছ) স্পার্টাক্যাস কে ছিলেন ?

(জ) জুলিয়াস সিজার কে ছিলেন ?

(ঝ) অক্টোভিয়াস কে ছিলেন ? তিনি কি উপাধি গ্রহণ করে নতুন রোমান সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন ?

(ঞ) যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাব কোথায় ঘটেছিল ?

(ট) যীশুখ্রীষ্ট কোন ধর্ম প্রচার করেছিলেন ? তাঁর অনুগামীদের কি বলা হয় ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ধরনের প্রশ্ন :

১। রোম জগতের প্রতিষ্ঠাতা কে ? রোম কি ভাবে সাধারণ-তন্ত্রে পরিণত হয়েছিল ?

২। রোম কি ভাবে ইতালীতে প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল ?

৩। রোমের সঙ্গে কার্থেজের যুদ্ধে কার্থেজের বিখ্যাত সেনাপতি কে ছিলেন ? এই যুদ্ধের পরিণতি কি হয়েছিল ?

৪। প্রাচীন রোমান সমাজে প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান কাদের বলা হত ? সমাজে তাদের স্থান কেমন ছিল ?

৫। কত বছর বয়সে রোমে নাগরিক অধিকার পাওয়া যেত? বিদেশীরা কি-ভাবে নাগরিক অধিকার পেত?

৬। স্পার্টাকাস বিদ্রোহ কাকে বলে? এই বিদ্রোহের পরিণতি কি হয়েছিল?

৭। সিজার কে ছিলেন? গলের সঙ্গে সিজারের যুদ্ধের ফল কি হয়েছিল? সিজার কোন কোন দেশ জয় করেছিলেন? সিজারকে কারা হত্যা করেছিলেন?

৮। অগাস্টাস কত বছর রাজত্ব করেছিলেন? তাঁর রাজত্বকালে কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম কর।

৯। রোমান সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ বলতে কি বোঝ? এই সময়ের পাঁচ জন রাজার নাম বল।

১০। যীশুখ্রীষ্টের জন্মস্থান কোথায়। তাঁর মায়ের নাম কি? কারা যীশুর শত্রুতা করেছিল? ক্রীশ্চান কাদের বলা হয়? কোন রোমান সম্রাট প্রথমে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন?

রচনাধর্মী প্রশ্ন:

১। রোম ও কার্থেজের সংঘর্ষের কাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। রোমের সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩। দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধে হ্যানিবলের ভূমিকা আলোচনা কর।

৪। জুলিয়াস সিজার সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লেখ।

৫। রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সম্রাট অগাস্টাসের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৬। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কারণ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৭। যীশুখ্রীষ্টের জীবনের কথা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১। সঠিক উত্তরটিতে ✓ চিহ্ন দাও:

(ক) যীশুখ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করেন কোন রোমান সম্রাটের রাজত্বকালে অগাস্টাস ▭ জুলিয়াস সিজার ▭ অরেলিয়াস ▭

(খ) কবি ভার্জিল কোন দেশের লোক ছিলেন?
গ্রীসের ▭ রোমের ▭ ইংল্যাণ্ডের ▭

২। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) রোমলাস ও রেমসে — নদীর তীরে রোম নগরীর পত্তন করেছিলেন।

(খ) পিউনিক যুদ্ধে কার্থেজের বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন —।

(গ) হ্যানিবল জামার যুদ্ধের — হাতে পরাজিত হয়েছিলেন।

(ঘ) রোমের উচ্চশ্রেণীর লোকদের বলা হত — আর সাধারণ লোকদের বলা হত —।

(ঙ) খ্রীষ্টীয় — শতককে রোমান সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

৯ চীন

[● মহৎ শাং ● কনফুসিয়াস ● তার শিক্ষা ● চীনের প্রাচীর ● চি'ন সাম্রাজ্য]

মহৎ শাং : খ্রীষ্টপূর্ব ষোড়শ শতকে শাং বংশীয় সম্রাটরা হোয়াং হো বা পীতনদীর মধ্যভাগে প্রাধান্য লাভ করেন। চীনের শাং বংশীয় রাজারা মহৎ পুরোহিত ও ঈশ্বরের পুত্র নামে পরিচিত। চীনের অন্যান্য বংশের ছোট ছোট রাজারা শাং সম্রাটকে সম্মান জানাত। প্রজার মঙ্গলের জন্য শাং সম্রাটরা পীত নদীর বন্যা রোধের চেষ্টা করেছিলেন।

এইযুগে চীনের মানুষেরা ব্রোঞ্জের ব্যবহার জানত। চাষবাস, পশুপালন ও শিকার করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। অভিজাতরা বিলাসী ছিল। তারা ক্রীতদাস রাখত। কৃষকরা মাটির ঘরে কোনরকমে মাথা গুঁজে থাকত। চীনে এইসময় পিতৃ-পুরুষের পূজার্চনা চলত। শাং সম্রাটরা শামুকের খোলে বা হাড়ের উপর লিখে বার্তা পাঠাতেন। চীনে ছবি এঁকে বা চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিতে লেখার চলন ছিল। শাং বংশের পর চৌ বংশের রাজারা প্রায় নয়শত বছর চীনে রাজত্ব করেছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে চীন আবার অনেকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। চীনের এই যুগকে বিশৃঙ্খলার যুগ বলা হয়।

কিন্তু এই সময় চিন্তার জগতে শিল্পে ও সভ্যতায় চীনের অভূতপূর্ব অগ্রগতি দেখা যায়। এই যুগে চীনের দার্শনিক ও ধর্ম প্রবর্তকদের মধ্যে কনফুসিয়াসের নাম অন্যতম। কনফুসিয়াস বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ৫৫১ সালে চীনের লু অর্থাৎ বর্তমান শানটু প্রদেশের একটি অভিজাতপরিবারেজন্মেছিলেন। ছেলেবেলায় তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। ফলে তাঁকে কষ্ট করে লেখাপড়া শিখতে হয়েছিল। বড় হয়ে তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন। কনফুসিয়াসের শিক্ষকতার সুনামে দলে দলে ছাত্ররা তাঁর



কনফুসিয়াস

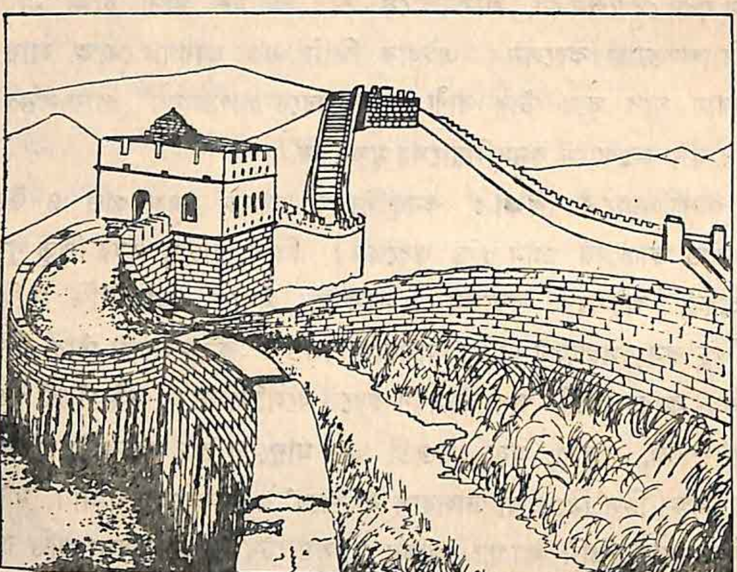
কাছে আসতে শুরু করে। কথিত আছে একসময় তাঁর ছাত্র হয়েছিল প্রায় তিনহাজার। পণ্ডিত হিসাবে তাঁর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কনফুসিয়াসের পাণ্ডিত্যের কথা শুনে লু'র রাজা তাঁকে একটি শহরের শাসন-কর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। পরে তিনি মন্ত্রীর পদ লাভ করেন। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন যে, শাসনকার্যে তাঁর পরামর্শ মানা হচ্ছে না তখন তিনি পদত্যাগ করলেন। এইবার তিনি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে ঘুরে তাঁর বাণী প্রচার করতে লাগলেন। প্রায় সত্তর বছর বয়সে স্বীয় জন্মস্থানে কনফুসিয়াসের মৃত্যু হয়।

কনফুসিয়াসের শিক্ষা ঃ কনফুসিয়াস অনেক সময় প্রশ্ন ও উত্তরের মারফতে ছাত্রদের জ্ঞান বৃদ্ধি করতেন। তিনি প্রাচীন ধর্মের পিতৃ পুরুষের আরাধনা অনুসরণ করতেন। সরকার, সমাজ, রাজনীতি নীতিবোধ সবকিছু কনফুসিয়াসের বিধির আওতায় পড়ত। কনফুসিয়াস তাঁর শিষ্যদের বিশেষ করে পাঁচটি গুণ অনুসরণ করতে বলেছিলেন। এই পাঁচটি গুণ হল আন্তরিকতা, সততা, দয়া, ভদ্রতা আর মানুষের শুভ বুদ্ধির উপর বিশ্বাস। তাঁর শিক্ষা ছিল নিজে যা ভালবাস না 'পরে' তা কভু কোরো না। মানুষের নীতিবোধকে তিনি জাগ্রত করেন। সম্রাটের প্রতি অচলা ভক্তি রাখতে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর পঞ্চপুস্তকে প্রাচীন চীনের কাব্য, গাঁথা ও পুঁথির সংকলন করেন। তাঁর শিষ্যরা কনফুসিয়াসের কথা ও কাহিনী সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। কনফুসিয়াসের সমসাময়িক ছিলেন লাওসে নামে আর একজন ঋষি।

অশোকের সমসাময়িক চীনের সম্রাট শি-হুয়াংতি চেয়েছিলেন তাঁর আগে চীনে যেসব বই লেখা হয়েছে তা পুড়িয়ে ফেলতে। কন-ফুসিয়াসের শিষ্যদের প্রচেষ্টায় তাঁর লেখা এই ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

চীনের প্রাচীর ঃ আর একটা কারণে শি-হুয়াংতি প্রসিদ্ধ। বর্বর হুণরা তাঁর রাজত্বকালে উত্তর চীনে হানা দিয়েছিল। তাদের হাত থেকে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য হুয়াংতি এক বিরাট প্রাচীর নির্মাণ করেন। তাঁর সময় উত্তর চীনে এর আগে যেসব প্রাচীর ছিল সেইগুলিকে যুক্ত করে ১৫০০০

মাইল লম্বা এক বিশাল দেওয়াল তৈরী হল। এই দেওয়ালের মাঝে মাঝে প্রহরীদের গম্বুজ ছিল। এখন মহাকালের সাক্ষীরূপে এই প্রাচীরের বেশীর ভাগ অংশ দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রাচীর বাইশ ফিট উঁচু ও বিশ ফিট চওড়া করা হয়েছিল। ফলে দুইজন ঘোড় সওয়ার পাশাপাশি এই



চীনের প্রাচীর

পাঁচিলের উপর দিয়ে যেতে পারত। কথিত আছে শতশত লোকের বাধ্যতামূলক শ্রমে মাত্র দশ বছরে এই প্রাচীর তৈরী হয়েছিল। চীনের এই প্রাচীর পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম। চীনে এইভাবে বাধা পেয়ে হুণরা ইউরোপে হানা দেয় ও চীনে আসার জন্য রাস্তার সন্ধান করতে থাকে।

চি'ন সাম্রাজ্য ঃ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে চি'ন বংশীয় রাজারা দেশ থেকে বিশৃঙ্খলা দূর করেন। চৌ সম্রাটদের শাসনের অবসান করে এবং ইয়েন ও অন্যান্য ছোট ছোট রাজ্য দখল করে তাঁরা চীনকে ঐক্যবদ্ধ করেন। ভারতের মৌর্য সম্রাটরা চি'ন বংশীয় রাজাদের সমসাময়িক ছিলেন। এই রাজবংশ থেকেই চীন তার নাম পেয়েছে বলে অনেকে অনুমান করেন। খ্রীষ্টপূর্ব ২৬৪ সালে এই বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট শি-হুয়াংতি সিংহাসনে

বসেছিলেন। তাঁর রাজত্বের প্রথম ২৫ বছরের মধ্যে সমগ্র চীন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। তার ফলে চীনের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং দেশের শাসন ব্যবস্থার উন্নতি হয়। শি-হুয়াংতির রাজত্বকালে রাজ্যে শান্তি বিরাজ করত। ফলে প্রজাদের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। এই সময় হুণ আক্রমণ থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য প্রসিদ্ধ চীনের প্রাচীর গড়া হয়েছিল। শি-হুয়াংতি মনে করতেন যে চীনের ইতিহাসে তিনিই প্রথম সম্রাট। তাঁর সিংহাসনে বসার আগেকার কথা লোকের জানার দরকার নাই। সেইজন্য তিনি চীনে সমস্ত পুরানো পুঁথি পুড়িয়ে ফেলার হুকুম দিয়েছিলেন। এই ব্যাপারে সম্রাটের পরামর্শদাতা ছিলেন তাঁর মন্ত্রী লিস্থ। এইসময় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক ও অন্যান্য সংস্কার হয়েছিল। সুশাসনের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যোগ্য শাসক নিযুক্ত হয়েছিল। এই যুগে চীনের লিপি ও মুদ্রার সংস্কার করা হয়। কিন্তু চীন সাম্রাজ্যের কৃষকরা অতিরিক্ত করভারে পীড়িত ছিল। ফলে শি-হুয়াংতির মৃত্যুর পর এই সাম্রাজ্য বেশীকাল স্থায়ী হয়নি। খ্রীষ্টপূর্ব ২০২ সালে হান বংশের রাজারা চীনে ক্ষমতা দখল করেছিলেন।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

(ক) শাং বংশ কখন প্রতিষ্ঠিত হয় ?

(খ) শাং যুগে প্রচলিত লিপি কি ধরনের ছিল ?

(গ) কনফুসিয়াস কে ছিলেন ?

(ঘ) চীনের প্রাচীর কে তৈরী করেছিলেন ?

(ঙ) শাং বংশের পর কোন রাজবংশ চীনে রাজত্ব করেছিলেন ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ধরনের প্রশ্ন ঃ

১। চীনের শাং বংশীয় রাজারা নিজেদের কি বলে পরিচয় দিতেন ? তাঁরা প্রজার মঙ্গলের জন্য কি করেছিলেন ?

২। ভারতের কোন সম্রাটরা চি'ন বংশীয় রাজাদের সমসাময়িক ছিলেন ?

৩। চীনের প্রাচীর কে কোন উদ্দেশ্যে তৈরী করেছিলেন ?

৪। কনফুসিয়াসের শিক্ষা কি ছিল ?

৫। চৌ সম্রাটদের পরে কোন বংশ চীনের ক্ষমতা দখল করে ?

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। শাং বংশের রাজত্বকাল সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২। কনফুসিয়াসের জীবনকাল সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩। কি কারণে এবং কার আমলে চীনের বিশাল প্রাচীর তৈরী হয়েছিল ?

১০ ভারতবর্ষ

[এক] আর্যদের আগমন

(ক) আর্যদের ভারতে আগমন ঃ আর্য একটা ভাষার নাম। আর্য ব'লে কোন জাতি নাই। যারা আর্যভাষা ব্যবহার করত বা আর্য ভাষায় কথা বলত তারাই আর্য নামে পরিচিত ছিল। এই আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল তা নিয়ে মতভেদ আছে। ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে, মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া অথবা হাঙ্গেরীতে আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল। কালক্রমে বিভিন্ন কারণে আর্যরা নিজেদের জায়গা ছেড়ে নূতন বাসভূমির সন্ধানে ইউরোপ, পারস্য ও ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। আর্যদের একটা শাখা আদি বাসস্থান থেকে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে।

আর্যরা কোন্ সময়ে ভারতে এসেছিলেন, তা সঠিকভাবে বলা যায় না। বোধ হয় খ্রীষ্টজন্মের দুই হাজার বছর আগে আর্যরা ভারতে আসেন। আর্যদের ধর্মগ্রন্থ ঋক্‌বেদ্ থেকে আমরা তাদের সমাজ ধর্ম, রাষ্ট্র ও শাসন পদ্ধতির সম্বন্ধে জানতে পারি। ভারতীয় আর্যদের এই সভ্যতা খ্রীষ্টজন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে ভারতে প্রসার লাভ করে। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, আর্যরা খ্রীষ্টজন্মের দুই থেকে দেড় হাজার বছরের মধ্যেই ভারতে আগমন করেন। তারপরে তাঁরা এক নতুন সভ্যতা গড়ে তোলেন। আর্য সভ্যতা বৈদিক সভ্যতা নামে পরিচিত। আর্যরা ভারতে সিন্ধুনদের উপত্যকায় তাঁদের প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। পরে আর্যরা উত্তর ভারত আর দক্ষিণ ভারতে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়েন।

(খ) বেদ ঃ আর্য সভ্যতার প্রাচীনতম গ্রন্থের নাম বেদ। বেদকে চারভাগে ভাগ করা হয়। ঋক্‌বেদ্, সামবেদ্, যজুর্বেদ আর অর্থববেদ্। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে বেদ স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী। বেদের আর এক নাম শ্রুতি। বেদ শব্দের যথার্থ অর্থ হচ্ছে জ্ঞান।

বেদের মূল অংশের নাম সংহিতা। সংহিতার টিকা হিসাবে ব্রাহ্মণ আর উপানিষদ লেখা হয়েছে। উপনিষদের যে অংশে দার্শনিক

আলোচনা হয়েছে তাকে আরণ্যক বলে। পরবর্তী বৈদিক যুগে সূত্র নামক গ্রন্থ রচিত হয়। সূত্র সাহিত্য, বেদাঙ্গ আর দর্শন এই দুই ভাগে বিভক্ত।

ঋক্‌বেদে আমরা গাথা আর কবিতার সংকলন পাই। যে মন্ত্রগুলি কেবলমাত্র যজ্ঞের জন্য দরকার তার সংগ্রহকে বলে যজুর্বেদ। যে মন্ত্রগুলি যজ্ঞের সময় সুর করে গাওয়া হয় তাকে বলে সামবেদ। আর অথর্ববেদে রয়েছে ভূত তাড়ানোর মন্ত্র, ঔষধ দেওয়ার মন্ত্র ইত্যাদি।

(গ) প্রাচীন আর্যদের সমাজ, ধর্ম এবং রাষ্ট্র : আর্য সমাজে পরিবারই ছিল জীবনের কেন্দ্র। পরিবারের প্রধানকে বলা হত গৃহপতি। সমাজে কন্যা অপেক্ষা পুত্রের আদর ছিল বেশী। কিন্তু মেয়েদের পড়াশুনা খুব ভাল করে শেখানো হত। বিশ্ববারা, ঘোষা, লোপামুদ্রা প্রভৃতি মহিলারা বেদের মন্ত্র রচনা করেছিলেন।

ঋক্‌বেদের সময় থেকেই আর্যসমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর শূদ্র এই চারিটি বর্ণ গড়ে ওঠে। বেদের পুরুষসূক্ততে উল্লেখ আছে যে, ব্রাহ্মণ-স্রষ্টার মুখ থেকে, রাজন্য বা ক্ষত্রিয় হস্ত থেকে, বৈশ্য উরু থেকে আর শুদ্র পদযুগল থেকে এসেছেন। পরবর্তী বৈদিক যুগে আর্যসমাজে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাস এই চার আশ্রমের প্রবর্তন করতেন। আর্যরা কার্পাস, হরিণের চামড়া আর পশমের পোশাক ব্যবহার করতেন। নীবি বা অন্তরবাস, বাস বা পরিধেয় এবং অধিবাস বা উত্তরীয় এই তিন অংশে তাঁদের পোশাক বিভক্ত ছিল। তাঁরা যব, গম, দুধ, মাংস প্রভৃতি খেতেন। দৌড় প্রতিযোগিতা শিকার, ঘোড়ায় চড়া, রথচালন, পাশা খেলা প্রভৃতি আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা ছিল।

ধর্ম : আর্যধর্মে বহু দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। কিন্তু বেদে বলা আছে যে, 'একই সত্যকে বিপ্ররা বিভিন্নরূপে বর্ণনা করেছেন।' প্রকৃতির এক একটি রূপকে তাঁরা দেবতা জ্ঞানে পূজা করতেন। বরুণ, ইন্দ্র, আদিত্য, মরুৎ, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি তাঁদের প্রধান দেবতা ছিলেন। বিষ্ণু, রুদ্র, প্রজাপতি, ব্রহ্মা এই যুগে দেবতারূপে পূজা পেতেন। পৃথিবী, অদিতি, সরস্বতী, উষা দেবী রূপে পূজিত হতেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের

দ্বারা আর্যগণ দেবতাদের আরাধনা করতেন। যজ্ঞের জন্য প্রত্যেক ঘরে একটি করে অগ্নিশালা থাকত।

রাষ্ট্র ঃ বৈদিক সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রধান ভিত্তি ছিল পরিবার। কয়েকটি পরিবার নিয়ে একটি গ্রাম গঠিত হ'ত। আবার কয়েকটি গ্রাম নিয়ে হ'ত বিশ। গ্রামের অধিপতিকে গ্রামনী আর বিশের অধিপতিকে বিশপতি বলা হ'ত। অথর্ববেদে রাজার নির্বাচনের উল্লেখ আছে। রাজন বা নৃপতি ছিলেন রাষ্ট্রের অধিপতি। রাজার কর্তব্য ছিল বৈদেশিক শত্রুর হাত থেকে প্রজাকে রক্ষা করা। রাজা গুপ্তচরের সাহায্যে রাজ্যের সংবাদ রাখতেন। প্রজার থেকে কর আদায় করতেন। পুরোহিতরা রাজাকে উপদেশ দিতেন। বেদে তুটি সংগঠনের নাম উল্লেখ আছে,—সভা আর সমিতি। রাজা সভা আর সমিতির পরামর্শ নিতেন। রাজা প্রজার মঙ্গল বিধান করবেন বলে শপথ গ্রহণ করতেন।

(ঘ) **মহাকাব্য ঃ** ভারতবর্ষের প্রাচীন তুই-মহাকাব্যের নাম মহাভারত ও রামায়ণ। বৈদিক সাহিত্য থেকেই এই তুই মহাকাব্যের আভাস পাওয়া যায়। বৈদিক যুগের পরেই তাই এসেছে মহাকাব্যের যুগ। তুই মহাকাব্যের বর্ণনা দেখে মনে হয় মহাভারত রামায়ণের আগে সৃষ্টি হয়েছিল।

মহাভারতের মূল রচয়িতার নাম ব্যাসদেব। এতে ১৮টি পর্ব আছে। ভরত নামে এক রাজার কাহিনী নিয়েই এর সূত্রপাত। পরবর্তীকালে মূল কাহিনীর সঙ্গে অনেক সংযোগ হয়। তার ফলে এই বিরাট মহাকাব্য গড়ে উঠেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত মহাভারতের রচনাকাল। ঐতিহাসিকদের মতে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে রামায়ণ রচিত হয়। রামায়ণের রচয়িতার নাম বাল্মিকী। রামায়ণ যদিও বিভিন্ন সময়ে লেখা তবুও তার ঘটনাবলীর মধ্যে একটা মিল বা ঐক্য আছে। এই মহাকাব্যে সাতটি কাণ্ড বা অধ্যায় আছে। শ্রীরামচন্দ্রের জীবনের কাহিনী নিয়েই রামায়ণের গল্প।

মহাকাব্যের যুগে বর্ণভেদ, বহু বিবাহ ও স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল। রাষ্ট্রে রাজাই ছিলেন সর্বেসর্বা, তবে রাজার আদর্শ ছিল প্রজার মঙ্গলসাধন করা। অশ্বমেধ, রাজসূয় ও অন্যান্য যাগযজ্ঞের প্রচলন ছিল।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) আর্য কাদের বলা হয় ? আর্যদের বাসস্থান কোথায় ছিল ?
(খ) আর্যদের প্রাচীনতম গ্রন্থ কি ?
(গ) বেদের আর এক নাম কি ?
(ঘ) আর্য পরিবারের প্রধানকে কি বলা হয় ?
(ঙ) ভারতের প্রাচীন মহাকাব্য কি কি ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ধরণের প্রশ্ন :

(১) আর্য বলিতে কি বোঝ ? আর্যরা কখন ভারতে এসেছিলেন ?
(২) বেদ কি ? বেদের অর্থ কি ? বেদ কয়ভাগে বিভক্ত ?
(৩) বেদের মূল অংশের নাম কি ? উপনিষদে কি আলোচনা করা হয়েছে ?
(৪) যজুর্বেদ ও সামবেদের বিষয়বস্তু কি ?
(৫) অথর্ববেদের আলোচ্য বিষয় কি ?
(৬) ঋক্‌বেদে আর্যসমাজের যে চারটি বর্ণের উল্লেখ আছে সেগুলির নাম কি ?
(৭) আর্যরা কি ধরণের পোশাক ব্যবহার করতেন ?
(৮) বৈদিক সমাজে রাজার কর্তব্য কি ?
(৯) চতুর্বর্ণাশ্রম বলতে কি বোঝ ?
(১০) মহা ভারতের মূল রচয়িতা কে ? মহাভারত কখন রচিত হয়েছিল ?
(১১) রামায়ণ কে রচনা করেছেন ? এতে কটি অধ্যায় আছে এবং কাহিনী কি ?

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

(১) বেদের সমকালে আর্যদের জীবনযাত্রা সংক্ষেপে আলোচনা কর।
(২) আর্যদের ধর্ম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।
(৩) আর্যদের রাষ্ট্রব্যবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
(৪) ভারতের কোন দুটো প্রাচীন গ্রন্থকে মহাকাব্য বলা হয় ? তাদের রচনাকাল সম্বন্ধে কি জান ?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

(ক) শূন্যস্থান পূরণ কর :
(১) আর্যসভ্যতা — সভ্যতা নামে পরিচিত।
(২) বেদ শব্দের যথার্থ অর্থ হচ্ছে —।
(৩) প্রাচীন দুই মহাকাব্যের নাম — ও — ।
(৪) মহাভারতের মূল রচয়িতার নাম —।
(খ) অশুদ্ধ কথা কেটে দাও :
(১) আর্য বলে কোন জাতি আছে / নেই।
(২) আর্য সভ্যতা দ্রাবিড় সভ্যতা / বৈদিক সভ্যতা নামে পরিচিত।

(৩) আর্যরা ভারতে সিন্ধুনদের উপত্যকায় / গঙ্গা নদীর উপত্যকায় প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল।

(৪) আর্যদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থের নাম রামায়ণ / বেদ / মহাভারত।

(৫) বেদ / মহাভারত। মহাভারতের মূল রচয়িতার নাম ব্যাসদেব / বাল্মিকী।

[দুই] জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব

জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উত্থান : খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে উত্তর-পূর্ব ভারতে এক প্রবল ধর্ম আন্দোলন হয়েছিল। এই সময় ধর্মের ব্যাপারে পুরোহিতদের প্রাধান্য, যাগযজ্ঞে পশুবধের নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি বিষয়ে বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি হয়। আর তার ফলে শুরু হ'ল এই ধর্ম আন্দোলন। এই ধর্ম অন্দোলনে বা বিপ্লবের প্রধান হোতা ছিলেন দুইজন ক্ষত্রিয় রাজকুমার। একজন হচ্ছেন জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীর আর একজন হচ্ছেন বুদ্ধধর্মের প্রবর্তক বৈশালীর কপিলাবস্তুর গৌতমবুদ্ধ।

মহাবীর : জৈন ধর্মের চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে শেষ দুইজন তীর্থঙ্কর হচ্ছেন পার্শ্বনাথ আর মহাবীর। মহাবীরের পিতার নাম সিদ্ধার্থ ও মাতার নাম ত্রিশ্‌লা। তাঁর যশোদা নামে এক রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহ হয় এবং ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করেন। দীর্ঘ বার বছর কঠোর সাধনা করার পর তিনি জিন্‌ বা জয়ীরূপে পরিচিত হন। এই জন্য মহাবীরের শিষ্যদের জৈন বলা হয়। জৈনগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। জাতি-ভেদ গ্রাহ্য করেন না। নির্বাণ-লাভই জৈন ধর্মের মূল আদর্শ। মহাবীর অহিংসাধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। সঠিক বিশ্বাস, জ্ঞানলাভ



মহাবীর

ও সদাচার এই তিনটি গুণ বা 'ত্রিরত্ন' পালনের ফলে আত্মার মুক্তি বা

নির্বাণলাভ সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। জৈনদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম আগম বা সিদ্ধান্ত।

গৌতম বুদ্ধঃ বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তকের নাম গৌতম বুদ্ধ। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬৬ সালে হিমালয়ের পাদদেশে লুম্বিনী নামক জায়গায় সিদ্ধার্থ বা গৌতমের জন্ম হয়। তাঁর পিতা শুদ্ধোধন ছিলেন কপিলাবস্তুর শাক্যদের অধিনায়ক। বুদ্ধের মাতার নাম মায়াদেবী। মাত্র ষোল বছর বয়সে তাঁর যশোধারা, বা গোপা নামে একটি কন্যার সঙ্গে বিবাহ হয় এবং রাহুল নামে তাঁর একটি পুত্র হয়। ২৯ বছর বয়সে সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেন। গয়ার কাছে উরুবিল্ব নামক একটি স্থানে তিনি কঠোর সাধনা করেন। পরে বুদ্ধ গয়াতে একটি পিপ্পল গাছের ছায়ায় ধ্যানে সমাহিত হন। কঠোর সাধনায় ক্রমশঃ শীর্ণ হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি বুদ্ধগয়ার নৈরঞ্জনা নদীতে স্নান করে একটি পিপ্পল গাছের ছায়ায় ধানে সমাহিত হন। কথিত আছে যে এই সময় সুজাতা নামে একটি বণিক কন্যা তাঁকে নিজ হাতে পায়স রান্না করে নিবেদন করে। এরপর তিনি দিব্যজ্ঞান বা নির্বাণ লাভ করেন। এই সময় তিনি বুদ্ধ বা জ্ঞানী বলে পরিচিত হন। নির্বাণলাভের পর তিনি সারনাথের মৃগদাবে প্রথম ধর্ম প্রচার করেন। তাঁর শিষ্যদের বলা হয় বৌদ্ধ। প্রায় ৪৫ বছর ধরে তিনি ধর্ম প্রচার করেন। অনেকের মতে খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮৬ সালে কুশীনগরে তিনি দেহত্যাগ করেন।



গৌতম

নির্বাণলাভের উপায়স্বরূপ তিনি শিষ্যদের "অষ্টাঙ্গিক মার্গ" অনুসরণ করতে বলেন। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ হল সৎ দৃষ্টি, সৎ বাক্য, সৎ ব্যবহার, সৎ সংকল্প, সৎ জীবন, সৎ চেষ্টা, সৎ স্মৃতি আর সম্যক সমাধি। অহিংসা বৌদ্ধ ধর্মের মূলমন্ত্র।

বুদ্ধদেব শরীরকে বেশী কষ্ট দেওয়া অথবা বিলাস ব্যসনে মত্ত থাকা এই দুটো অভ্যাসই ত্যাগ করতে বলেছিলেন। সববিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিত। মাতাপিতা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু ও পরিচিত সকলের সঙ্গে সুব্যবহার, জীবে দয়া ইত্যাদি সাধারণের পক্ষে যা সহজবোধ্য সেই উপদেশ বিতরণ করেছিলেন। ফলে বৌদ্ধধর্মের বাণী সকলের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিল। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের নাম ত্রিপিটক।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

(ক) জৈনধর্মের প্রবর্তক কে ?
(খ) বৌদ্ধধর্ম্ম কে প্রচার করেছেন ?
(গ) মহাবীরের বাবা ও মায়ের নাম কি ?
(ঘ) মহাবীর কোন ধর্ম প্রচার করেছেন ? তার শিষ্যদের কি বলা হয় ?
(ঙ) জৈনদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম কি ?
(চ) সিদ্ধার্থ কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ? তাঁর পিতামাতার নাম কি ?
(ছ) সিদ্ধার্থ কোথায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন ? সিদ্ধিলাভের পর তাঁর নাম কি হয়েছিল ?
(জ) অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলতে কি বোঝ ?
(ঝ) বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র কি ? বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের নাম কি ?

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। কি পরিস্থিতিতে প্রাচীন ভারতে ধর্ম আন্দোলন শুরু হয়েছিল ? এই ধর্ম আন্দোলনের নেতা কারা ছিলেন ?
২। মহাবীর কে ছিলেন ? তিনি কোন ধর্ম প্রচার করেছিলেন ? তাঁর প্রচারিত ধর্মের মূল কথা কি ছিল ?
৩। বুদ্ধের জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা কর। তিনি কি শিক্ষা নিয়েছিলেন ?

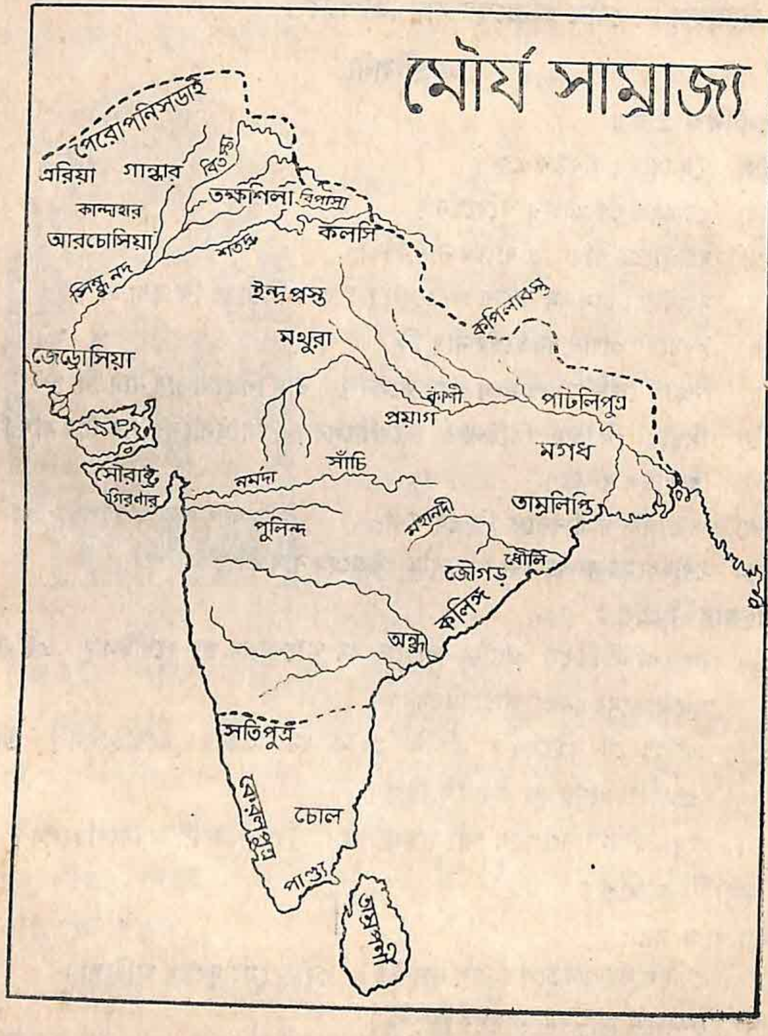
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

হ্যাঁ বা না বল ঃ
(ক) বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তকের নাম মহাবীর। বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র অহিংসা।
(খ) জৈনধর্মে কুড়িজন তীর্থঙ্কর ছিলেন।
(গ) রাহুল নামে বুদ্ধদেবের একটি পুত্র ছিল।
(ঘ) জৈনদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম ত্রিপিটক।

[তিন] প্রাচীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার যুগ

মৌর্য, কুষাণ ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন :

খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৪ সালে মগধের অধিপতি ধননন্দকে পরাজিত করে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নাম মৌর্য বংশ। কথিত আছে চন্দ্রগুপ্ত অত্যাচারী নন্দবংশকে ধ্বংশ করবার জন্য গ্রীক বীর



আলেকজান্দারের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তিনি বিন্ধ্য পর্বতে পালিয়ে যান। এইখানে কৌটিল্য নামে

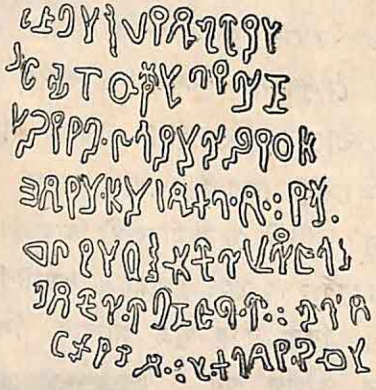
এক ব্রাহ্মণের সহায়তায় পার্বত্য জাতি ও দস্যু-তস্করদের নিয়ে চন্দ্রগুপ্ত একটি শক্তিশালী সৈন্যদল গঠন করেন। এই সৈন্যদলের সাহায্যে তিনি নন্দবংশ উচ্ছেদ করেন ও মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর ভারতে নিযুক্ত গ্রীকশাসনকর্তারা দুর্বল হয়ে পড়ায় তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারত তাদের কবল থেকে উদ্ধার করেন। আলেকজান্দারের সেনাপতি সেলুকাস পুনরায় গ্রীকদের অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করলে চন্দ্রগুপ্ত তাঁকে সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য করেন। ৫০০ রণহস্তীর বিনিময়ে তিনি সেলুকাসের কাছ থেকে কাবুল, কান্দাহার, হিরাট ও মাকরান লাভ করেন। তিনি জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন।

অশোক ঃ (খ্রীঃ পূর্ব ২৭৩-২৩৬) পরবর্তী সম্রাট বিন্দুসার সাম্রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করেন নি। কিন্তু তাঁর পুত্র অশোক সিংহাসন লাভ করবার ১৩ বছর পরে কলিঙ্গ জয় করেন। কলিঙ্গ যুদ্ধের হত্যা ও রক্তপাতে অশোকের মনে তীব্র অনুশোচনা হয়। অশোক অতঃপর দিগ্বিজয়ের আদর্শ ত্যাগ করে ধর্মজয়ের আদর্শ গ্রহণ করেন। তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অশোকের শিলালিপি ও স্তম্ভলিপি থেকে জানা যায় যে, তাঁর সাম্রাজ্য আফগানিস্থান থেকে বঙ্গদেশ, বঙ্গোপসাগর থেকে আরবসাগর ও হিমালয় থেকে মহীশূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি দক্ষিণ ভারতে চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র প্রভৃতি স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিতে বৌদ্ধধর্মের প্রচারক পাঠিয়েছিলেন। তিনি সিরিয়া, মিশর, ম্যাসিডন, এপ্রিরাস ও অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য দূত পাঠিয়েছিলেন। সবাইকে জানানোর জন্য অশোক ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠিলিপিতে তাঁর উপদেশ



অশোক

লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তিনি সিংহলে রাজপুত্র মহেন্দ্রকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। অশোক মানুষ ও পশুর জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। তাঁর রাজত্বকালে বিশ্রামাগার স্থাপন করে, বৃক্ষ রোপন



ব্রাহ্মীলিপিতে অশোকের শিলা লেখ

করে ও কূপ খনন করে সাধারণের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়। অশোক অহিংসা ধর্ম পালনের উপদেশ দিয়েছিলেন।

কুষাণ সাম্রাজ্য ঃ কুষাণরা মধ্য এশিয়ার যাযাবর ইউচি জাতির একটি শাখা ছিল। কুষাণনেতা কুজুল কদফিস গ্রীক আর পল্লবদের পরাজিত করে আফগানিস্থান আর কান্দাহার অধিকার করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী বিম কদফিস গান্ধার থেকে কাশী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। বিম কদফিসের পর কুষাণবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কণিষ্ক সিংহাসনে আরোহণ করেন। গান্ধার, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, সিন্ধুর ভাওয়ালপুর অঞ্চল, মথুরা, রাজপুতানা, মালব ও কাথিয়াওয়াড় অঞ্চল তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কণিষ্ক মধ্যএশিয়ার কাশগড়, ইয়ারখন্দ ও খোটান জয় করেন। কাশ্মীর তাঁর অধীন ছিল। পুরুষপুর বা পেশোয়ার তাঁর রাজধানী ছিল। তিনি বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কণিষ্কের মুদ্রায় হিন্দু, পারসিক ও গ্রীক দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কিত আছে। বিখ্যাত চিকিৎসক চরক, আর দার্শনিক নাগার্জুন ও বসুমিত্র, লেখক অশ্বঘোষ প্রভৃতি কণিষ্কের রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। পরবর্তী কুষাণ রাজাদের মধ্যে বসিষ্ক, হুবিষ্ক, দ্বিতীয় কণিষ্ক ও বাসুদেবের নাম উল্লেখযোগ্য।

গুপ্তবংশ ঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে ভারতবর্ষে গুপ্তবংশ এক বিরাট সাম্রাজ্যের সূচনা করেন। এই বংশের প্রথম শক্তিশালী রাজার নাম প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (খ্রীষ্টাব্দ ৩২০)। তিনি লিচ্ছবী রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করেন। পুত্র সমুদ্রগুপ্তকে তিনি তাঁর জীবিতকালেই উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করে গিয়েছিলেন।

সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করে উত্তর ভারত জয়ে অগ্রসর হন। তিনি নাগসেন, গণপতিনাগ, রুদ্রসেন, মতিল, নাগদত্ত, অচ্যুত, চন্দ্রবর্মণ প্রভৃতি রাজাদের পরাজিত করে প্রায় সমগ্র আর্যাবর্ত নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারতে ধর্মবিজয়ের আদর্শ অনুসরণ করেন। কোসলের মহারাষ্ট্র, মহেন্দ্র, ব্যাঘ্ররাজ, হস্তীবর্মণ, বিষ্ণুগোপ, পিস্টাপুরের (পিটাপুরম্) মহেন্দ্র প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের পরাজিত নৃপতিদের বশ্যতার বিনিময়ে সমুদ্রগুপ্ত তাঁদের নিজ রাজ্যে পুনঃস্থাপন করেছিলেন। উত্তর ভারতের কতকগুলি গোষ্ঠীরাষ্ট্র যেমন মালব, যৌধেয়, মদ্রক, আভীর প্রভৃতি গুপ্তসম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করেছিল। সীমান্তের কতকগুলি রাষ্ট্র যেমন সমতট, কামরূপ, নেপাল, দবাক (জলন্ধর বা গাড়োয়াল) ও কার্তিপুর (নওগা, আসাম) তাঁকে নিয়মিত কর প্রদান করত। সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ সমুদ্রগুপ্তের অনুমতি নিয়ে বুদ্ধগয়াতে একটি মঠ নির্মাণ করেছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত কেবলমাত্র দিগ্বিজয়ী বীরই ছিলেন না, শিল্প ও সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ ছিল। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৩৭৫ থেকে ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়।



সমুদ্রগুপ্ত

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ঃ (৩৮০-৪১৩ বা ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁর পিতার মত দিগ্‌বিজয়ের নীতি অনুসরণ করেছিলেন। তিনি নাগরাজবংশের কুবেরনাগাকে বিবাহ করেন। সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁর কন্যা প্রভাবতীদেবীকে দাক্ষিণাত্যের বাকাটক বংশের রাজা দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সঙ্গে বিবাহ দেন। এই বিবাহের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রভাব প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত গুজরাট ও কাথিয়াওয়াড়

রাজ্য দখল করেছিলেন। তিনি শকদের পরাজিত করে 'শকারী' উপাধি লাভ করেন। তিনি বিক্রমাদিত্য উপাধিতেও ভূষিত ছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও দিল্লীতে প্রাপ্ত মেহেরুলী স্তম্ভলিপির রাজা চন্দ্র এক ও অভিন্ন। এইসব পণ্ডিতের মতে তিনি বাহ্লিক দেশ (বাবালখ) জয় করেছিলেন। অমর কবি কালিদাস তাঁর রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন।

কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত ঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর কুমারগুপ্ত (৪১৫-৪৫৫) ও স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫-৪৬৭) পর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুমারগুপ্তের সময়ে গুপ্তসাম্রাজ্যের সীমা আরবসাগর থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। স্কন্দগুপ্ত পরাক্রান্ত হূণদের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। তাঁর পরে সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

(ক) মৌর্য বংশ কে প্রতিষ্ঠা করেন?

(খ) কৌটিল্য কে ছিলেন?

(গ) অশোক কে ছিলেন?

(ঘ) কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে?

(ঙ) গুপ্তবংশের প্রথম শক্তিশালী রাজা কে?

(চ) গুপ্তবংশের কোন রাজা বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেছিলেন?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ধরণের প্রশ্ন ঃ

১। মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? তিনি কিভাবে এই বংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

২। কলিঙ্গ যুদ্ধ অশোকের মনে তীব্র অনুশোচনার সৃষ্টি করেছিল কেন?

৩। সম্রাট অশোক দিগ্বিজয়ের ইচ্ছা ত্যাগ করে ধর্মবিজয় গ্রহণ করলেন কেন?

৪। কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি কে? তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত রাজ্যগুলির নাম লেখ?

৫। সমুদ্রগুপ্ত আর্যাবতের কোন্ কোন্ রাজাকে পরাজিত করেছিলেন?

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন কেন? বৌদ্ধধর্ম প্রচারে অশোকের কৃতিত্ব বর্ণনা কর।

২। অশোকের জনহিতকর কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৩। কুষাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় কণিষ্কের কৃতিত্ব আলোচনা কর।
৪। সমুদ্রগুপ্ত সম্বন্ধে যা জান লেখ।
৫। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ
১। চন্দ্রগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নাম — ।
২। — যুদ্ধের হত্যা ও রক্তপাতে অশোকের মনে অনুশোচনা হয়।
৩। কুষাণবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা — ।
৪। গুপ্তবংশের প্রথম শক্তিশালী রাজার নাম — ।
৫। শকদের পরাজিত করে — শকারী উপাধি লাভ করেন।

(খ) সঠিক উত্তরটিতে ✓ চিহ্ন দাও ঃ
(১) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কার সহায়তায় নন্দবংশকে পরাজিত করেছিলেন ?
আলেকজান্দার ▭ সেলুকাস ▭ কৌটিল্য ▭
(২) কুষাণদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল ?
পূর্ব ইউরোপে ▭ মধ্যভারতে ▭ মধ্য এশিয়ায় ▭
(৩) শকদের পরাজিত করে কে শকারি উপাধি পান ?
সমুদ্রগুপ্ত ▭ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ▭ স্কন্দগুপ্ত ▭

[চার] প্রাচীন বাংলার কথা

প্রাচীন বাংলা ঃ গুপ্তযুগের পতন পর্যন্ত

ভারতের যে অঞ্চলে বাঙ্গালীর বাস তার নাম বঙ্গদেশ (বাংলা)। প্রাচীন হিন্দুযুগে সমস্ত বঙ্গদেশ কোনও একটি বিশিষ্ট নামে অভিহিত হ'ত না। বাংলা কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্র ও বারেন্দ্রী, পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত, দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, বঙ্গাল প্রভৃতি অনেকগুলি জনপদ ছিল। উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কতকাংশ গৌড় নামে পরিচিত ছিল।

কিন্তু বাংলার ইতিহাসের আরম্ভ কোন্ সময় এ কথা জানতে হলে প্রথমেই আমাদের কতকগুলি ইতিহাসের উপাদানের উপর নির্ভর করতে

হবে। বাংলার আদিম অধিবাসীদের কথা জানতে হ'লে আমাদের তাদের ব্যবহৃত প্রত্নপ্রস্তর ও তাম্রযুগের অস্ত্র-শস্ত্রের সম্পর্কে জানতে হবে। বাংলায় কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতি এই আদিম অধিবাসীদের বংশধর। এদের "নিষাদজাতি" বলেও কেউ কেউ আখ্যা দিয়েছেন। নিষাদ জাতির পর দ্রাবিড় ভাষাভাষী ও আলপাইন শ্রেণীভুক্ত একজাতি বাংলায় বাস করত, এইসব বিভিন্ন গোষ্ঠী বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি করে।

বৈদিকযুগের শেষভাগে আর্য সভ্যতা বিস্তারের ফলে আর্যদের ভাষা, ধর্ম ও সামাজিক প্রথা বাংলায় প্রভাব বিস্তার করে। বেদের আরণ্যকে বঙ্গ নামে একটি স্থানের উল্লেখ আছে। বাংলার প্রাচীন অনার্য জাতি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে আর্য সমাজে মিলে মিশে গিয়েছিল।

রামায়ণে সমৃদ্ধ জনপদগুলির তালিকায় 'বঙ্গ' নামের উল্লেখ আছে। মহাভারতে বাংলার কয়েকটি রাজ্যের কথা বলা হয়েছে। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভায় বঙ্গরাজ, পৌণ্ড্রাজ ও তাম্রলিপ্তির রাজা উপস্থিত ছিলেন। ভীমসেন পৌণ্ড্রাজ বাসুদেব এবং বঙ্গরাজ সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেনকে পরাজিত করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বঙ্গরাজ দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। জৈন "উপাঙ্গ পন্নবনা" গ্রন্থে আর্যজাতির তালিকায় বঙ্গ এবং রাঢ়ের উল্লেখ আছে। জৈন "কল্পসূত্র" গ্রন্থে জৈন্য সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অন্যতম শাখার নাম তাম্রলিপ্তি শাখা। জৈন প্রজ্ঞাপনা গ্রন্থে তাম্রলিপ্তি বঙ্গজনদের অধিকারে ছিল বলে উল্লেখ আছে।

জাতকের গল্পে ও বৌদ্ধ গ্রন্থে, নৌ-বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে তাম্রলিপ্তির উল্লেখ আছে। সিংহল দেশীয় 'মহাবংশ' নামে পালিগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, লঙ্কাদ্বীপে একটি বাঙ্গালী রাজবংশ পুরুষানুক্রমে রাজত্ব করেছিলেন। এই বংশের সিংহবাহুর নাম অনুসারে লঙ্কাদ্বীপের নাম হয় সিংহল। তবে এই কাহিনী যে কতটা সত্য তা বলা যায় না।

অধিকাংশ গ্রীক লেখকের বর্ণনা থেকে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, খ্রীঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে আলেকজান্দার যখন ভারত আক্রমণ করেন সেইসময় মগধের রাজা বাংলা থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেছিলেন। অনেকেই

অনুমান করেন যে, ইনি পাটলিপুত্রের নন্দবংশীয় কোন রাজা। এই সময় পরাক্রান্ত গঙ্গারিডি জাতি বাংলায় বসবাস করত। প্রাচীনকালে বাংলা মৌর্যসাম্রাজ্যের অংশ ছিল। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ তাঁর ভারত পরিভ্রমণের সময় তাম্রলিপ্ত ও পৌণ্ড্রবর্ধনে অশোকের কিছু স্তূপ দেখতে পান। বিভিন্ন শীলমোহর ও শিলালিপি থেকে জানা যায় যে চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে অথাৎ সমুদ্রগুপ্তের সময় বাংলা গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ধরণের প্রশ্ন ঃ

১। প্রাচীন বাংলার কয়েকটি ভাগের নাম লেখ।

২। রামায়ণ ও মহাভারতে বাংলা সম্বন্ধে কি জানা যায় ?

৩। গঙ্গারিডিরা কোথায় বাস করত ?

৪। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাচীন বাংলার কি ইতিহাস জানা যায় ?

[পাঁচ] বিদেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ

অতি প্রাচীন কাল থেকে বিদেশীরা ভারতে এসেছে আর ভারতীয়রা বিদেশে যাতায়াত করেছে। সিন্ধু-সভ্যতার মানুষের মেসোপটেমিয়াতে বাণিজ্য সূত্রে যোগাযোগ ছিল। আর্যরা এবং সম্ভবতঃ দ্রাবিড়রাও বাইরে থেকে ভারতে এসেছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে পারসিক ও ম্যাসিডনীয় আক্রমণের সময় ভারতীয় ও বিদেশীদের যোগাযোগ হয়। পরপরে বাহ্লিক গ্রীক, শক্, পহ্লব ও কুষাণরা ভারতে এসেছিলেন। মধ্যএশিয়ার ইউচি জাতির শাখা কুষাণরা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে ভারতে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের যুগে হূণেরা ভারতে এসেছিলেন। এইসব বহিরাগত জাতি ভারতীয়দের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছেন।

ভারতীয়রাও বিদেশে গিয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। বাণিজ্যের জন্য ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যোগাযোগ হয়।

কথিত আছে যে, কৌণ্ডিন্য নামে একজন ভারতীয় দক্ষিণ কম্বোডিয়াতে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তর কম্বোডিয়াতে কম্বোজ রাজ্যটিও একজন ভারতীয়ের প্রচেষ্টার ফলে গড়ে উঠেছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। আঙ্কোরভাটের মন্দির কম্বোডিয়াতে হিন্দুপ্রভাবের অন্যতম নিদর্শন। ব্রহ্মদেষ (সুবর্ণভূমি), মালয় (সুবর্ণদ্বীপ) ও কম্বোডিয়াতে পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের সঙ্গে স্থানীয় পৌরাণিক কাহিনীর অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও ও বলিদ্বীপকে কেন্দ্র করে শৈলেন্দ্র রাজারা রাজত্ব করতেন। খ্রীষ্টীয় নবম শতকে জাভায় আরেকটি স্বাধীন ভারতীয় রাজ্যের সৃষ্টি হয়। বরবুদুরের মন্দির জাভায় বৌদ্ধ প্রভাবের অন্যতম নিদর্শন। পারস্য, আরবদেশ, মিশর ও পূর্বআফ্রিকার সঙ্গে ভারতীয় বণিকরা পরিচিত ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ভারত ও চীনের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়। মধ্য এশিয়ার পথে বণিকরা চীন ও পশ্চিম এশিয়াতে যাতায়াত করতেন।

মধ্যএশিয়া : মধ্যএশিয়ার পথ দিয়ে পশ্চিম এশিয়া ও চীনের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। মধ্যএশিয়াতে ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্রগুলির মধ্যে কুচা, তুরফানের প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এই সব নগরগুলি মধ্যএশিয়াতে বণিকদের যাতায়াতের পথের দুই পাশ দিয়ে গড়ে উঠেছিল। বর্তমানকালে খনন করে এইসব জায়গায় হিন্দু দেব-দেবীদের মূর্তি, বৌদ্ধবিহার, প্রাকৃত ও সংস্কৃতলিপি পাওয়া গেছে। ফাহিয়ানের কাহিনী থেকে প্রসিদ্ধ গৌতম বিহারের কথা জানা যায়। পরবর্তীকালে হিউয়েন সাং কিছুকাল খোটানের রাজা বিজিত সিংহের অতিথি ছিলেন। রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে মধ্যএশিয়ার এইসব ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্র ধ্বংস হয়ে যায়।

সমাজে বৈদেশিক সংযোগের প্রভাব : আর্য ও আর্যপূর্ব যুগের আচার, আচরণ ও ধর্ম ভারতীয় সমাজে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। পরবর্তীকালে গ্রীক, শক, পহ্লব, কুষাণ, হুণ এবং আর যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা এই দেশের সমাজে স্থান করে নিয়েছেন। তার ফলে ভারতীয়সমাজ ও সভ্যতায় এক অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। বৈদেশিকরা অনেক সময়

ভারতীয় ধর্ম গ্রহণ করেছেন। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে হেলিওডোরাস নামে একজন গ্রীক বিদিশায় বাসুদেবের নামে একটি গরুড় স্তম্ভ স্থাপন করেন। গ্রীক রাজা মিনান্দার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। কুষাণ রাজারা বৌদ্ধধর্ম প্রসার করেন। বিদেশীরা বৌদ্ধধর্মে মূর্তিপূজার বা মহাযান মতের চল করেছিলেন। ফলে প্রাচীন বৌদ্ধমত হীনযান বলে পরিচিত হয়। গ্রীক ও শক রাজারা জাতি বিচারে ক্ষত্রিয়ের সম্মান লাভ করেন।

বাণিজ্য ঃ ভারতের সঙ্গে বহির্বিশ্বের বাণিজ্য ছিল জলপথে ও স্থলপথে। পাটলিপুত্র থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত ছিল মৌর্যযুগের রাজপথ। তক্ষশিলা থেকে বিভিন্ন বাণিজ্য পথ চলে গিয়েছিল মধ্য-এশিয়াতে। মধ্যএশিয়া থেকে বণিকেরা রেশম পথে চীনে যাতায়াত করতেন। দক্ষিণে কান্দাহার হয়ে পারস্যের সঙ্গে যোগাযোগের রাস্তা ছিল। জলপথে বাণিজ্যের জন্য মৌসুমী বায়ুর সাহায্যে বাণিজ্য তরী কাবেরীপটনম, ভৃগুকচ্ছ তাম্রলিপ্ত ও অন্যান্য ভারতীয় বন্দরে যাতায়াত করত। চীন ও রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য ছিল। ভারত থেকে মসলিন, রেশম বস্ত্র, সূতী কাপড়, হীরামুক্তা, মশলা বাইরে যেত। তার বদলে ভারত লাভ করত প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা আর আমদানী করত মণিমুক্তা, হাতীর দাঁত, চীনা পট, খেজুর, মদ, দাসদাসী ও বিলাসদ্রব্য।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরণের প্রশ্ন ঃ

(ক) শৈলেন্দ্র রাজারা কোন্ কোন্ জায়গায় রাজত্ব করতেন ?

(খ) কোন্ গ্রীকরাজা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন ?

(গ) হিউয়েন সাঙ কিছুকাল কোন্ রাজার অতিথি ছিলেন ?

(ঘ ভারত থেকে কোন্ কোন্ জিনিস বাইরে রপ্তানী করা হোত ?

(ঙ) মধ্যএশিয়ায় কতকগুলি ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্রের নাম কর।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

[এক] শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

সিন্ধু সভ্যতার মানুষের — বাণিজ্য সূত্রে যোগাযোগ ছিল। কথিত আছে — নামে একজন ভারতীয় দক্ষিণ — একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মধ্য এশিয়াতে

ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্রগুলির মধ্যে — — নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে — নামে একজন গ্রীক — বাসুদেবের নামে একটি গরুড় স্তম্ভ স্থাপন করেন। দক্ষিণে — হয়ে পারস্যে যাওয়া যেত।

[দুই] হ্যাঁ কি না লেখ :—

(ক) গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের যুগে হূণরা ভারতে এসেছিলেন (খ) চীনে বরবুদুরের মন্দির বৌদ্ধ প্রভাবের অন্যতম। (গ) হিউয়েন সাংয়ের কাহিনী থেকে প্রসিদ্ধ গৌতম বিহারের কথা জানা যায়।

[ছয়] বিদেশী পর্যটকদের দৃষ্টিতে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ

প্রাচীনকালে ভারতে যেসব দূত ও ভ্রমণকারীরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়ে সেলুকাস প্রেরিত দূত মেগাস্থিনিস্, গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে সেলুকাস প্রেরিত দূত মেগাস্থিনিস্, গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ফা-হিয়েন এবং হর্ষবর্ধনের রাজসভায় আগত হিউয়েন সাং-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইসব ভ্রমণকারীদের লিখিত বিবরণী থেকে তখনকার অনেক তথ্য জানা যায়।

মেগাস্থিনিস্ বর্ণিত সমাজ : তৎকালীন ভারতে অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী ছিলেন। কৃষকদের মধ্যে কারও কারও নিজস্ব জমি ছিল। কৃষিজীবী, মেষপালক, পশুপালক প্রভৃতিরা গ্রামে বাস করতেন। তাঁতী, কুমার, কামার, ছুতার, প্রভৃতি শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা শহরে বাস করতেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ রাজার অধীনে কাজ করতেন, আর বাকিরা জনসাধারণের প্রয়োজনের চাহিদা মেটাতেন। বাণিজ্যও প্রসার লাভ করেছিল। বণিকরা তাদের পণ্যদ্রব্য দেশ-বিদেশে পৌঁছে দিতেন। বহুলোক সৈনিকের কাজ করতেন। মন্ত্রী, রাজকর্মচারী, অধ্যক্ষ ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা নগরে এবং গ্রামে নানা সম্মানিত হতেন। তাঁদের কোন রাজকর দিতে হত না। মেগাস্থিনিস, দার্শনিক, কৃষক, পশুপালক ও শিকারী, শিল্পী ও ব্যবসায়ী, সৈনিক গুপ্তচর এবং অমাত্য এই ৭টি শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন।

ফা-হিয়েন বর্ণিত সমাজ : তৎকালীন দেশের দণ্ডবিধির কঠোরতা ছিল না। ফা-হিয়েন বলেছেন এই দেশে দস্যু তস্করের উপদ্রবের কথা কম শোনা যায়। সাধারণ মানুষ শান্তিপ্রিয় এবং সৎ ছিলেন। জমি চাষের

জন্য রাজস্ব দিতে হত। দেশে প্রাণীহত্যার চল ছিল না। অস্পৃশ্যতা মানা হোত। চণ্ডাল ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা নগরের বাইরে বাস করতেন। ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা শান্তিতে পাশাপাশি বাস করতেন।

অনুশীলনী

[এক] প্রাচীন ভারতের তিনজন বৈদেশিক ভ্রমণকারীর নাম লেখ।

[দুই] মেগাস্থিনিস্ বর্ণিত সমাজে কারা কারা গ্রামে ও কারা কারা শহরে বাস করতেন? তাঁর বিবরণীতে যে ৭টি শ্রেণীর উল্লেখ আছে তাদের নাম লেখ।

[তিন] ফা-হিয়েন বর্ণিত সমাজ সম্বন্ধে যা জান লেখ।

[সাত] প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি

স্থাপত্য ঃ প্রাচীন ভারতে শিল্পকলায় ভারতীয়দের ধর্ম দর্শন ও বাস্তব জীবনের চিত্র পাওয়া যায়। সিন্ধুসভ্যতার উৎকর্ষের নিদর্শন পাওয়া যায় তার স্থাপত্যে আর ভাস্কর্যে। মৌর্য পূর্বযুগের স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যের নমুনা দেখা যায় বিহারের রাজগৃহের ধ্বংসাবশেষে। পাটলি-পুত্রের মৌর্যপ্রাসাদ ছিল কাষ্ঠ নির্মিত। কাজেই এই প্রাসাদ স্থায়ী হয় নাই। মৌর্যযুগ ও তারপরে, বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্য সাধুদের জন্য অনেক সময় পাহাড় কেটে চৈত্যগুহা, তৈরী হয়েছে। এইগুলির মধ্যে বারবারা চৈত্যগুহা, নাসিক, কালে ভাজা ও বেদসার গুহার নাম করা যায়। এইসময় বুদ্ধের দেহাবশেষ রাখার জন্য অনেক স্তুপ বানানো হয়েছে। এদের মধ্যে ভূপালের সাঁচী মধ্যভারতের ভারহুত এবং দক্ষিণ ভারতের অমরাবতীর স্তূপ প্রসিদ্ধ। এইসব স্তূপের তোরণ ও বেষ্টনীতে বুদ্ধের জীবনকাহিনী নিয়ে রচিত জাতক গল্প খোদাই করা আছে। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টাব্দ সপ্তম শতকের মধ্যে অজন্তার গুহাগুলি নির্মিত হয়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে নির্মিত ইলোরা গুহার কৈলাস মন্দিরের স্থাপত্য অতুলনীয়। ভিটারগাঁও এবং দেওগড়ে গুপ্তযুগের ইটের তৈরী মন্দির পাওয়া গেছে। পরবর্তী যুগের স্থাপত্যে মামল্লাপুরমের পল্লবমন্দির, তাঞ্জোরে চোলযুগের শিবমন্দির, ভুবনেশ্বর লিঙ্গরাজ মন্দির, খাজুরাহোর মন্দির (বুন্দেল খণ্ড), ও পুরীর জগন্নাথ

মন্দিরের নাম উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ভারতের গোপুরম্ বা মন্দির তোরণ গঠনের রীতি পরবর্তী যুগে চালু হয়েছিল।

ভাস্কর্য : মসৃণতা ও সৌন্দর্যে অশোকস্তম্ভের সিংহমূর্তি মৌর্য-ভাস্কর্যের উৎকর্ষের অন্যতম নিদর্শন। বোধগয়া, ভারহুত ও সাঁচীর তোরণ শিল্পে ও সৌন্দর্যে অতুলনীয়। নাগার্জুনী কুণ্ড ও অমরাবতীর ভাস্কর্য দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পরীতিতে সমুজ্জ্বল। উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক ও ভারতীয় রীতির সংযোগে গান্ধার শিল্পের সৃষ্টি হয়। এই শিল্প কুষাণযুগে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। কিন্তু এইযুগে মথুরায় তৈরী মূর্তিতে বৈদেশিক প্রভাব মুক্ত ছিল। ভাস্কর্য শিল্পে গুপ্তযুগ অতুলনীয়। সারনাথে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি এর অন্যতম নিদর্শন। মামলাপুরমের গঙ্গাবতরণ মূর্তি পল্লবযুগের শিল্পের একটি উজ্জ্বল নমুনা। দক্ষিণ ভারতের নটরাজ শিব ও মহীশূরের গোমাতা মূর্তি, পাল যুগের ধাতু ও পাথরের কাজ পরবর্তী যুগের ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন।



অজন্তাগুহার চিত্র

চিত্রশিল্প : চিত্রশিল্পে অজন্তাগুহার চিত্রগুলি অনন্য। এইগুলির অধিকাংশ গুপ্তযুগের কীর্তি। অজন্তার আঁকা এই ছবিগুলির মধ্যে 'মরণাপন্ন রাজকুমারী 'মাতা ও সন্তানের' চিত্র অন্যতম। ইলোরাতে রাষ্ট্রকূটযুগের চিত্রের নমুনা পাওয়া যায়। বাঘগুহা, বাদামী, সীতন্নবাসিতল ও রাজরাজ মন্দিরে প্রাচীন ভারতের চিত্রশিল্পের নমুনা দেখা যায়।

সাহিত্য : আর্যরা বেদ, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের রচয়িতা। পরবর্তী যুগে বেদব্যাসের মহাভারত ও বাল্মীকির রামায়ণ রচিত হয়। সংস্কৃত-

কাব্যের মধ্যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে রচিত অশ্বঘোষের বুদ্ধ-চরিতের নাম উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত সাহিত্যের স্বুবর্ণযুগে গুপ্তসম্রাটদের আমলে কবি কালিদাস তাঁর মেঘদূত, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। পরবর্তীযুগের কবিদের মধ্যে সপ্তম শতকের লেখক ভর্তৃহরি ও বাণ এবং দ্বাদশশতকের গীতগোবিন্দের লেখক জয়দেবের নাম করা যায়। কাহিনী-কাব্যের মধ্যে বৃহদ্‌কথা, কথাসরিৎসাগর, কলহণের রাজতরঙ্গিণী, বিলহণের বিক্রমাংকদেব চরিত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত নাটকেও কালিদাসের লেখা মালবিকাগ্নিমিত্র, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, বিক্রমোর্বশী অগ্রগণ্য। এছাড়া অন্যান্য নাট্যকারের মধ্যে ভবভূতি, শূদ্রক, ও বিশাখদত্ত খ্যাতি লাভ করেন। গদ্যে দণ্ডিণের দশকর্মচরিত, স্ুবন্ধুর বাসবদত্তা, বাণের হর্শচরিত, পঞ্চতন্ত্র এবং ও পালিজাতকের নাম করা যায়। পরবর্তীকালে তামিল, কানাড়া, বঙ্গভাষা ও অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় সাহিত্যের সূত্রপাত হয়।

শিক্ষা : প্রাচীন ভারতে উচ্চবর্ণের বালকদের শিক্ষার জন্য গুরুগৃহে পাঠানোর প্রথা ছিল। ছাত্রজীবনকে ব্রহ্মচর্য আশ্রম বলা হয়। এই সময় বেদ, বেদাঙ্গ ও তার সঙ্গে দর্শন, সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র গণিত ও অন্যান্য কয়েকটি বিষয় পড়ানো হত। পরবর্তীকালে মধ্যযুগের ইউরোপের প্রসিদ্ধ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতন ভারতে কাশী, তক্ষশিলা প্রভৃতি স্থানের শিক্ষায়তন প্রসিদ্ধ ছিল। তখনকার কৃতী-ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন বৈয়াকরণিক পাণিনি, চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্য ও প্রসিদ্ধ চিকিৎসক চরক। গুপ্তযুগে বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুদূর দেশ থেকে ছাত্ররা এসে বসবাস করতেন। নালন্দার ব্যয়ভার হর্ষবর্ধনের মত দানশীল রাজারা বহন করতেন। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে প্রখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং আচার্য শীলভদ্রের কাছে শিক্ষার জন্য নালন্দায় যোগদান করেছিলেন। এখানে বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্র ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদান করা হ'ত। হিউয়েন সাং বলেন যে, 'ভারতে এইরূপ সহস্র সহস্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু কোনটিই নালন্দার মত প্রভাবশালী নয়।" তুর্কী আক্রমণে নালন্দা ধ্বংস হয়।

বিজ্ঞান : প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চার অগ্রগতি লক্ষণীয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্যভট্ট সিদ্ধান্ত করেন যে, পৃথিবী সূর্যকে

প্রদক্ষিণ করে। কালক্রমে তাঁর সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে বরাহমিহিরের লেখায় রোমক সিদ্ধান্ত, পৌলিস সিদ্ধান্তের উল্লেখ দেখে মনে হয় যে, ভারতীয়রা পাশ্চাত্যের জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথা ভালভাবেই জানতেন। সংখ্যাগণনা, দশমিক প্রথার ও শূন্যের ব্যবহার প্রথমে ভারতেই চালু হয়। এইজন্য আরবরা গণিতকে 'হিন্দি সত' এই নামে অভিহিত করেছেন। ধাতুর ব্যবহারে প্রাচীন ভারতের দক্ষতার অন্যতম প্রমাণ দিল্লীতে রাজা চন্দ্রের মেহেরৌলী লৌহস্তম্ভ। ভারতীয় রাসায়নিকরা নানারকমের ঔষধ বানাতে পারতেন। প্রাচীন ভারতের চিকিৎসকদের মধ্যে চরক, সুশ্রুত, জীবক প্রভৃতির নাম স্মরণীয়। অশোক মানুষ ও পশুর চিকিৎসার জন্য দেশে বিদেশে চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। কেহ কেহ দাবী করেন যে, ভারতীয়রা বারুদের ব্যবহার জানতেন। কিন্তু এই উক্তির স্বপক্ষে কোন যুক্তিসম্মত প্রমাণ নাই।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ধরণের প্রশ্ন :

(ক) বুদ্ধের দেহাবশেষ রাখার জন্য কোন্ কোন্ জায়গার স্তূপ প্রসিদ্ধ ?
(খ) গান্ধার শিল্প কোন্ যুগে উৎকর্ষ লাভ করেছিল ?
(গ) প্রাচীন ভারতের কোন্ কোন্ নাট্যকারের নাম লেখ।
(ঘ) কবি কালিদাস কে ছিলেন। তাঁর রচিত কয়েকখানি কাব্যের নাম লিখ।
(ঙ) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে যা জান লেখ। হিউয়েন সাঙ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কি বলেছিলেন ?
(চ) আর্যভট্ট কে ছিলেন ? তিনি পৃথিবী সম্বন্ধে কি বলেছিলেন ?
(ছ) প্রাচীন ভারতের কয়েকজন বিখ্যাত চিকিৎসকের নাম লেখ ?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

[এক] হ্যাঁ কি না লেখ—

(ক) পাটলিপুত্রের মৌর্যপ্রাসাদ ছিল পাথরের তৈরী। (খ) অমরাবতীর ভাস্কর্য দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পরীতিতে সমুজ্জল। (গ) ইলোরাতে মৌর্যযুগের চিত্রের নমুনা পাওয়া যায়। (ঘ) আর্যরা বেদ, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের রচয়িতা। (ঙ) আর্যভট্ট সিদ্ধান্ত করেন যে, সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে।

[দুই] শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

মসৃণতা ও সৌন্দর্যে অশোক স্তম্ভের — মৌর্যভাস্কর্যের অন্যতম নিদর্শন। বোধগয়া — ও — তোরণ শিল্পে ও সৌন্দর্যে অতুলনীয়। উত্তর-পশ্চিম ভারতে — ভারতীয় রীতির সংযোগে — শিল্পে কুষাণ যুগে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল।